মাসিক
আত-তাহরীক

১৪তম বর্ষঃ ৭ম সংখ্যা

সূচীপত্র

✡ **সম্পাদকীয়** ০২
✡ **প্রবন্ধ :**
❑ পবিত্র কুরআনে বর্ণিত ২৫ জন নবীর কাহিনী *(২৫/১০ কিস্তি)* ০৩
- মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
❑ ইসলামের আলোকে জ্ঞান চর্চা *(পূর্ব প্রকাশিতের পর)* ১৭
- ড. মুহাম্মাদ আজিবার রহমান
❑ মানব জাতির প্রকাশ্য শত্রু শয়তান ২১
-মুহাম্মাদ আবদুল ওয়াদূদ
❑ ধর্মদ্রোহিতা ২৭
-মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান
✡ **মনীষী চরিত :** ২৯
♦ মাওলানা অহীদুয্যামান লক্ষ্ণৌভী : তাক্বলীদের বন্ধন ছিন্নকারী খ্যাতিমান মুহাদ্দিছ *-নূরুল ইসলাম*
✡ **নবীনদের পাতা :** ৩২
♦ **অশান্ত মধ্যপ্রাচ্য : উৎসের সন্ধানে**
-যাকওয়ান হুসাইন
✡ **হাদীছের গল্প :** ৩৫
♦ সৎ লোকের দো'আ
✡ **গল্পের মাধ্যমে জ্ঞান :** ৩৬
♦ কূট কৌশলের পরিণাম
✡ **চিকিৎসা জগৎ :** ৩৭
♦ কিডনী রোগ চিকিৎসায় খাদ্যের ভূমিকা
✡ **ক্ষেত-খামার :** ৩৮
♦ বিদ্যুৎবিহীন হিমাগারে শাক-সবজি ও ফলমূল সংরক্ষণ
♦ গাভী পালন করে স্বাবলম্বী
♦ নার্সারী খুলেছে ভাগ্যের দুয়ার
✡ **কবিতা :** ৩৯
♦ ভুয়া মুসলিম ♦ গ্রীষ্মের আম বাগান ♦ উপহার
✡ **সোনামণিদের পাতা** ৪০
✡ **স্বদেশ-বিদেশ** ৪১
✡ **মুসলিম জাহান** ৪৩
✡ **বিজ্ঞান ও বিস্ময়** ৪৪
✡ **সংগঠন সংবাদ** ৪৫
✡ **প্রশ্নোত্তর** ৪৯

সম্পাদকীয়

প্রস্তাবিত নারী উন্নয়ন নীতিমালা

১৯৭৫ সালে মেক্সিকোতে অনুষ্ঠিত ১ম বিশ্ব নারী সম্মেলনে অংশ গ্রহণের পর থেকে বাংলাদেশ সর্বপ্রথম আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে পা রাখে এবং বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ফোরামে গৃহীত নারী নীতি সমূহে জোরালো সমর্থন ও ভূমিকা রাখতে শুরু করে। অতঃপর ডিসেম্বর ১৯৭৯-তে জাতিসংঘে 'নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদ 'সিডো' (CEDAW) গৃহীত হয়। এ সনদে স্বাক্ষরকারী প্রথম ১০টি দেশের অন্যতম হ'ল বাংলাদেশ। এই সিডো-কে বলা হয় কুরআন ও ইসলামী পরিবার ব্যবস্থার বিরুদ্ধে একটি 'নীরব টাইম বোমা'। ফলে বিগত কোন সরকারই এ সনদ বাস্তবায়নে সাহসী হয়নি। অথচ গত ৭ই মার্চ '১১ মন্ত্রীসভা এটি হুবহু অনুমোদন করে। পরদিন সরকারী সংবাদ সংস্থা (বাসস) পরিবেশিত খবরে বলা হয় যে, ভূমি সহ সম্পদ, সম্পত্তি ও উত্তরাধিকারে নারীর সমানাধিকারের স্বীকৃতি দিয়ে নারী উন্নয়ন নীতিমালা ২০১১-এর খসড়া মন্ত্রীসভায় অনুমোদিত হয়েছে। এতে আলেম সমাজ তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করলে তিনদিন ধরে মহিলা ও শিশু বিষয়ক প্রতিমন্ত্রীর অফিস কক্ষে বসে ঘষামাজা করে অবশেষে ২৫(২) ধারায় বলা হয়, 'উপার্জন, উত্তরাধিকার, ঋণ, ভূমি এবং বাজার ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে অর্জিত সম্পদের ক্ষেত্রে নারীর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণের অধিকার প্রদান করা'। ২৩(৫) ধারায় বলা হয়, সম্পদ, কর্মসংস্থান, বাজার ও ব্যবসায় নারীকে সমান সুযোগ ও অংশীদারিত্ব দেওয়া। ১৭(৫) ধারায় বলা হয়, স্থানীয় বা রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে কোন ধর্মের, কোন অনুশাসনের ভুল ব্যাখ্যার ভিত্তিতে নারী স্বার্থের পরিপন্থী এবং প্রচলিত আইন বিরোধী কোন বক্তব্য প্রদান বা অনুরূপ কাজ বা কোন উদ্যোগ গ্রহণ না করা। ১৭(৩) ধারায় বলা হয়, নারীর মানবাধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিদ্যমান আইন সংশোধন ও প্রয়োজনীয় নতুন আইন প্রণয়ন করা'। অতঃপর ১৭(২) ধারায় গিয়ে আসল কথা ফাঁস করে দিয়ে বলা হয়, 'নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদ (সিডো)-এর প্রচার ও বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা'। ফলে জাতিসংঘ ঘোষিত এই 'সিডো' বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনে দেশের সংবিধান, আইন ও রাষ্ট্রীয় নীতি সবই বদল হ'তে পারে। একই সময় ঢাকায় নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত জেমস মারিয়ার্টি সকল ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সমতা নিশ্চিত করার তাকীদ দিয়ে বক্তব্য দিলেন *(১৫ মার্চ ইনকিলাব ১/৪ কলাম)*। অন্যদিকে ইসলামিক ফাউণ্ডেশনের ৩৬তম

প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে প্রধান অতিথির ভাষণে মাননীয়া প্রধানমন্ত্রী বললেন, আওয়ামী লীগ কখনোই কোরআন-সুন্নাহ পরিপন্থী কোন আইন প্রণয়ন করবে না। সঙ্গে সঙ্গে তিনি একথাও বলেন, যাদের পুত্র সন্তান নেই তাদের মেয়েরা তাদের রেখে যাওয়া সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হ'তে পারে না। ভাইয়ের ছেলে-মেয়েরা সেসব সম্পত্তি দখল করে নেয়' (তাঁর এ বক্তব্য একেবারেই অজ্ঞতা প্রসূত)। তিনি বলেন, নারী উন্নয়ন নীতিমালা ভালোভাবে পড়ে আপনারা বলুন কোথায় কোরআন-সুন্নাহ্র পরিপন্থী কথা আছে'। মাননীয়া প্রধানমন্ত্রী পিতা-মাতার সম্পত্তি যাতে তাদের স্ত্রী-কন্যারা পেতে পারেন, সে ব্যাপারে পরামর্শ দেয়ার জন্য সংশ্লিষ্টদের প্রতি আহ্বান জানান *(২৩ মার্চ '১১, ইনকিলাব ১/৭ কলাম)*। উক্ত আহ্বানের জওয়াবে সরকার সমর্থিত ৬ দলীয় ইসলামী সংগঠনের নেতৃবৃন্দ সংবাদ সম্মেলন করে আইনমন্ত্রী এবং মহিলা ও শিশু বিষয়ক প্রতিমন্ত্রীকে একচোট নিয়ে বলেন, আসলে সরকারের ভিতরে ঘাপটি মেরে থাকা মহল বিশেষ সরকারকে বিতর্কিত করার হীন মানসিকতা নিয়ে রাজপথ উত্তপ্ত করার সুযোগ করে দিচ্ছে' *(১৫ মার্চ '১১ ইনকিলাব ২/৫ কলাম)*।

উপরোক্ত আলোচনায় স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও মহাজোট ঘোষিত কুরআন-সুন্নাহ পরিপন্থী কোন আইন না করার নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি একদিকে এবং সরকারের পিছনে অদৃশ্য থিংকট্যাংক-এর কর্মনীতি ঠিক তার বিপরীত দিকে ধাবিত হয়েছে। পিছনের সেই অপশক্তি কারা, সেটা বুঝতে কারু বাকী থাকার কথা নয়। যারা হত-দরিদ্র ও দুর্দশাগ্রস্ত অগণিত নারীর দুঃখ-বেদনা দূর করার চেষ্টা বাদ দিয়ে সরকারকে ঈমানদার জনগণের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেবার চক্রান্ত করছে।

প্রায় দেড় শতাধিক উপধারা সহ ৪৯টি ধারা সম্বলিত প্রস্তাবিত বিশালদেহী নারী উন্নয়ন নীতিমালাকে এক লাইনে ব্যক্ত করা যায়। যেটি বাংলাদেশ সংবিধানের ২৮ (২) ধারায় বর্ণিত হয়েছে যে, 'রাষ্ট্র ও সমাজ জীবনের সর্বস্তরে নারী পুরুষের সমান অধিকার লাভ করিবেন'। সাথে সাথে সংবিধানের ৪১ (১-ক) ধারায় বলা হয়েছে 'প্রত্যেক নাগরিকের যেকোন ধর্ম অবলম্বন, পালন বা প্রচারের অধিকার রহিয়াছে'। এর দ্বারা বুঝা যায় যে, খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা, শিক্ষা প্রভৃতি মৌলিক অধিকার ভোগ করার দিক দিয়ে রাষ্ট্রের সকল নাগরিকের অধিকার সমান। সাথে সাথে যে নারী যে ধর্মের অনুসারী, সেই ধর্ম অনুযায়ী সে তার জীবন পরিচালনা করবে। সংবিধানে এরূপ স্পষ্ট বক্তব্য থাকার পরেও নতুন করে নারী উন্নয়ন নীতিমালা প্রণয়নের উদ্দেশ্য কি? উদ্দেশ্য নিশ্চয়ই একটা আছে। যেটা কোন সাধু উদ্দেশ্য নয়। বরং জাতিসংঘে গৃহীত ধর্মনিরপেক্ষ সনদ অনুযায়ী দেশ পরিচালনা করা এবং এ দেশের অধিকাংশ নাগরিকের অনুসৃত ইসলামী সমাজ ও পরিবার ব্যবস্থা ভেঙ্গে তছনছ করা। চাতুর্যপূর্ণ কথামালার ফাঁদে আটকিয়ে তারা জনগণকে বোকা বানাতে চান। সেই সাথে তারা পাশ্চাত্যের বস্তুবাদীদের ন্যায় এদেশের ধর্মপ্রাণ নারী সমাজকে স্রেফ ভোগ্যপণ্যে পরিণত করতে চান। জাতিসংঘে গৃহীত 'নারীর প্রতি যাবতীয় বৈষম্য বিলোপ সনদ' (সিডো) অমুসলিমদের জন্য এবং বিশেষ করে পাশ্চাত্যের নগ্নতাবাদীদের জন্য প্রযোজ্য হ'তে পারে। কেননা ঐসব দেশের অধিকাংশ নাগরিক পিতৃ পরিচয়হীন। এজন্য নারী যেহেতু দুর্বল এবং সন্তান যেহেতু তারাই গর্ভে ধারণ করেন, তাই পরিবারের বন্ধন, সহানুভূতি ও স্নেহ-ভালোবাসার স্পর্শহীন এইসব অসহায় নারীদের প্রতি 'বৈষম্য বিলোপ সনদ' (সিডো) প্রয়োজন। মুসলিম সমাজে এরূপ সনদের কোন প্রয়োজন নেই। যেসব দেশে এ সনদ বাস্তবায়িত হয়েছে, সেসব দেশের নারীরা এর দ্বারা কতটুকু কল্যাণ লাভ করেছে? খোদ জাতিসংঘেরই নারী কর্মকর্তারা তাদের সহকর্মী পুরুষ কর্মকর্তাদের দ্বারা নিয়মিত ধর্ষিতা হন বলে পত্র-পত্রিকায় সম্প্রতি রিপোর্ট বের হয়েছে। ইরাকে দখলদার আমেরিকান নারী সৈন্যদের শতকরা ৯০ জন (বরং সকলেই) তাদের পুরুষ সৈন্যদের দ্বারা নিয়মিত ধর্ষিতা হন। এমনকি তারা আত্মরক্ষার জন্য গুলিভর্তি পিস্তল ব্যতীত টয়লেটে যেতে পারেন না। সম্ভবত ঐসব দেশে ব্যভিচার ও নারী নির্যাতন কোন অপরাধ নয়। কিন্তু আমাদের দেশে পরনারীর দিকে কপট উদ্দেশ্যে চোখ তুলে তাকানো অমার্জনীয় অপরাধ। তাই ইসলামী সমাজে পর্দানশীন নারীরা যত বেশী নিরাপদ, ধর্মনিরপেক্ষ সমাজে তার কল্পনাও করা যায় না। আর সে কারণেই তারা 'সিডো' সনদ রচনা করেছে নিজেদের বাঁচানোর জন্য। যদিও তাতে তারা বাঁচতে পারেনি। বরং দিন দিন তাদের অবস্থার অবনতি হচ্ছে। পাশ্চাত্যের শিক্ষিতা মহিলারা এখন দলে দলে ইসলাম কবুল করছেন। এমনকি সদ্য সাবেক বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী টনি ব্লেয়ারের শ্যালিকা খ্যাতনাম্নী মহিলা সাংবাদিক 'লোরেন বুথ' সম্প্রতি মুসলমান হয়েছেন ও সাথে সাথে হিজাব পরিধান করে পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতের মাধ্যমে আল্লাহ্র নিকটে আত্মসমর্পণ করে শান্তিময় জীবন শুরু করেছেন। জাতিসংঘের গৃহীত 'নারীর প্রতি বৈষম্য বিলোপ সনদ' তাদের জীবনে কোন কল্যাণ বয়ে আনেনি।

আল্লাহ প্রেরিত এলাহী ধর্মগুলি ব্যতীত বিগত যুগে পৃথিবীর কোন সমাজে নারীর কোন সম্মানজনক অধিকার স্বীকৃত ছিল না। এই সেদিনও ভারতে বিধবা বিবাহ নিষিদ্ধ ছিল এবং যুবতী বিধবাকে মৃত স্বামীর জ্বলন্ত চিতায় হাত-পা বেঁধে ছুঁড়ে মেরে জীবন্ত পুড়িয়ে মেরে উলুধ্বনি দিয়ে বলা হ'ত, ঐ যে সতী নারী স্বর্গে চলে গেল। আজও সেদেশে পিতৃ সম্পত্তিতে কন্যার উত্তরাধিকার স্বীকৃত নয়। আর তাই বিয়ের সময় কন্যাকে যত সম্ভব যৌতুক

দিয়ে বিদায় করে দেওয়া হয়। বিকৃত ইহুদী ও খৃষ্টধর্মে নারীকে ‘সকল পাপের উৎস’ গণ্য করা হয় এবং তারা নারীকে ঘবপবংংধৎু বারষ অর্থাৎ ‘যরূরী পাপ’ বলে তাদের বিবাহের অনুমতি দেয়। তারা নারীকে ‘দোযখের দরজা’ বলে এবং তাদেরকে ‘পৃথিবীর সকল অশান্তির কারণ’ বলে মনে করে। সেজন্যে তারা বলে ‘যে ব্যক্তি কন্যাকে বিয়ে দেয় না, সেই-ই উত্তম কাজ করে’। খৃষ্টান সমাজে ‘নারীকে পুরুষের সম্পত্তি’ মনে করা হয়। তাই সেখানে ‘নারীকে তালাক দেওয়ার অধিকার এককভাবে পুরুষের হাতে’। বিখ্যাত রাষ্ট্রনীতিবিদ জন স্টুয়ার্ট মিল (১৮০৬-৭৩) তাই তার ঝঁনলবপঃরড়হ ড়ভ ড়িসধহ নামক প্রবন্ধে বলেছেন যে, আমাদেরকে বারবার বলা হয় যে, সভ্যতা ও খৃষ্টবাদ নারীর ন্যায় সঙ্গত অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেছে। অথচ আমরা দেখি যে, তারা স্বামীর সেবাদাসী ছাড়া কিছুই নয়। অন্তত আইনের চোখে তারা ক্রীতদাসীই বটে’। এখন পাশ্চাত্যে বিবাহ-পূর্ব মিলন, বিবাহ-পরবর্তী মিলন, বিবাহ ছাড়াই লিভ টুগেদার, কুমারী মাতা, সমকামিতা ইত্যাদি নোংরা প্রথা সমূহ চালু হয়েছে। এমনকি ঐসব দেশে প্রতি মিনিটে কয়জন নারী ধর্ষিতা হয়, তারও রিপোর্ট বের হচ্ছে। জাহেলী আরবেও কমবেশী অনুরূপ অবস্থা কিছু কিছু লোকের মধ্যে বিদ্যমান ছিল। নারীরা পিতৃ সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হ’ত না। ইসলাম আসার পরে সবকিছুর অবসান ঘটে এবং নারীরা পৃথিবীর ইতিহাসে সর্বপ্রথম তাদের মানবিক অধিকার ফিরে পায়। যা বিগত ও আধুনিক কোন সভ্যতাই তাদেরকে দেয়নি।

ইসলামের উত্তরাধিকার আইন :

ইসলামী পারিবারিক বিধানে নারী ও পুরুষ পরস্পরের পোষাক সদৃশ *(বাক্বারাহ ১৮৭)*। তারা একে অপরের পরিপূরক এবং কেউ কারু থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। ইসলামী পরিবারে ‘মায়ের পদতলে সন্তানের জান্নাত’ *(নাসাঈ, মিশ, হা/৪৯৩৯)*। ‘পিতার সন্তুষ্টিতে আল্লাহর সন্তুষ্টি’ *(তির, মিশ, হা/৪৯২৭)*। ‘রক্তের সম্পর্ক আরশের সাথে ঝুলন্ত’। যে তা দৃঢ় রাখে, আল্লাহ তার সাথে থাকেন। যে তা ছিন্ন করে, আল্লাহ তাকে পরিত্যাগ করেন’ এবং ‘ঐ ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না’ *(মুত্তা, মিশ, হা/৪৯২১-২২)*। ‘স্ত্রীর নিকটে স্বামী সবচেয়ে শ্রদ্ধার পাত্র *(তির, মিশ, হা/৩২৫৫)* এবং ‘ঐ স্বামীই সর্বোত্তম যে তার স্ত্রীর নিকট সর্বোত্তম’ *(তির, মিশ, হা/৩২৬৪)*। ‘কন্যা সন্তানের প্রতি উত্তম আচরণ তার পিতা-মাতার জন্য জাহান্নাম থেকে বাঁচার কারণ হবে’ *(মুত্তা, মিশ, হা/৪৯৪৯)*। ইসলামী পরিবারে নারী এবং তার সন্তানাদি ও পরিবারের ভরণপোষণ সহ যাবতীয় বাইরের দায়-দায়িত্ব পুরুষের। পক্ষান্তরে নারী হ’ল গৃহকর্ত্রী। সন্তান পালন ও সংসার গোছানো তার প্রধান দায়িত্ব। সংসারে একজন নারী তার পিতার স্নেহ, ভাইয়ের ভালোবাসা, স্বামীর প্রেম ও সন্তানের শ্রদ্ধার বন্ধনে আবদ্ধ। কমপক্ষে উপরোক্ত চারজন পুরুষের নিরাপত্তা বেষ্টনীতে একজন নারী সর্বদা নিরাপদ আশ্রয়ে নিশ্চিন্ত জীবন যাপন করে। কেবল হৃদয়ের বন্ধন নয়, বরং অর্থনৈতিক বন্ধনেও তারা আবদ্ধ। এজন্য ইসলাম নারীকে তার পিতা, ভাই, স্বামী ও সন্তানের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে উত্তরাধিকার প্রদান করেছে। এভাবে একটি মুসলিম পরিবার পরস্পরে অবিচ্ছিন্ন একটি দেহের রূপ ধারণ করে। তাই উত্তরাধিকার বণ্টনে ইসলাম অত্যন্ত দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়েছে এবং নারী ও পুরুষের ন্যায্য অধিকার নিশ্চিত করেছে। আল্লাহ বলেন, ‘পিতা-মাতা ও নিকটাত্মীয়দের পরিত্যক্ত সম্পদে পুরুষের অংশ রয়েছে... এবং নারীদের অংশ রয়েছে, কম হৌক বা বেশী হৌক একটি নির্ধারিত অংশ’ *(নিসা ৭)*। তিনি বলেন, ‘তোমাদের সন্তানদের ব্যাপারে আল্লাহ এই বিধান দিচ্ছেন যে, একজন পুত্রের অংশ দু’জন কন্যার সমান হবে। যদি কন্যার সংখ্যা দু’য়ের অধিক হয়, তবে তারা পরিত্যক্ত সম্পদের দুই তৃতীয়াংশ পাবে। আর যদি মাত্র একটি কন্যা সন্তান থাকে, তাহ’লে সে অর্ধেক পাবে... মৃতের ঋণ পরিশোধ ও অছিয়ত পূরণ করার পরে’ *(নিসা ১১)*। মৃতের স্ত্রী-কন্যারা তাদের জন্য নির্ধারিত অংশ ব্যতীত উদ্বৃত্ত সব সম্পত্তির মালিক কখনোই হবেন না, যতক্ষণ মৃতের অন্য কোন নিকটাত্মীয় বা আছাবাহ থাকেন। যদি কেউ না থাকেন, তখনই কেবল উদ্বৃত্ত সম্পত্তির সবটা কন্যা পাবেন ‘রদ’-এর বিধান অনুযায়ী। কিন্তু স্ত্রী বা স্বামী নন। এমতাবস্থায় উদ্বৃত্ত সম্পদ ইসলামী রাষ্ট্রের বায়তুল মালে জমা হবে। অথবা জনকল্যাণে দান করে দিবে। ইসলামী উত্তরাধিকার নীতিতে মীরাছ লাভের ভিত্তি হ’ল রক্ত ও আত্মীয়তার সম্পর্ক। কিন্তু যদি কেউ হত্যাকারী হয় অথবা মুরতাদ হয়, তাহ’লে সে নিহত ব্যক্তির এবং মুসলিম আত্মীয়ের মীরাছ পাবে না। অনুরূপভাবে কোন জারজ সন্তান তার পিতার অংশ পাবে না। ইসলামের এই উত্তরাধিকার নীতি চিরন্তন বিধান হিসাবে অবতীর্ণ হয়েছে, যা পরিবর্তনযোগ্য নয়। কিন্তু ‘এক পুত্রের অংশ দু’কন্যার সমান’ এই বিষয়টিকে কথিত নারীবাদীরা টার্গেট বানিয়েছে এবং সরকারের ঘাড়ে বন্দুক রেখে কুরআনী বিধানকে ছিন্ন-ভিন্ন করে সেখানে জাতিসংঘের রচিত মনগড়া বিধান ‘সিডো’ চাপিয়ে দেওয়ার ও তা বাস্তবায়নের দুঃস্বপ্ন দেখা হচ্ছে। অথচ আল্লাহ বলেন, ‘তোমার প্রভুর কালাম সত্য ও ন্যায় দ্বারা পরিপূর্ণ। তাকে পরিবর্তনকারী কেউ নেই। তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ *(আন‘আম ১১৫)*।

এক্ষণে ইসলামের উক্ত মীরাছ বণ্টন নীতি কত নিখুঁত ও দূরদর্শী, তা আমরা ভেবে দেখব। যেমন (১) স্বাস্থ্য ও স্বভাবগত কারণে ইসলাম নারী ও পুরুষের দায়িত্ব ও কর্মক্ষেত্র পৃথক করে দিয়েছে

এবং উভয়ের জন্য সকল ক্ষেত্রে ন্যায্য অধিকার নিশ্চিত করেছে। সেকারণ নারীকে সন্তান ধারণ ও লালন-পালন এবং সংসার দেখাশুনার দায়িত্ব দিয়েছে। সাথে সাথে তাকে পরিবারের ভরণ-পোষণ ও অর্থোপার্জন সহ অন্যান্য গুরুদায়িত্ব পালনের বোঝা বহন করা থেকে মুক্তি দিয়েছে এবং একাজ পুরুষের উপর চাপিয়েছে। উভয়ের বুদ্ধিমত্তা, শরীর ও স্বভাবকে আল্লাহ ভিতর ও বাইরের দায়িত্ব পালনের উপযোগী করে সৃষ্টি করেছেন। ফলে দায়িত্ব বেশী থাকার কারণে পুরুষকে মীরাছের অংশ বেশী দেওয়া হয়েছে।

(২) নারীকে তার মৌলিক প্রয়োজন তথা খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা ইত্যাদির ব্যাপারে দায়মুক্ত রাখা হয়েছে এবং এসব দায়িত্ব পুরুষের উপর অর্পণ করা হয়েছে। সেকারণ পুরুষের অংশ দ্বিগুণ করা হয়েছে। (৩) মেয়েরা স্বামীর কাছ থেকে তার মর্যাদার প্রতি সম্মান হিসাবে মোহরানা লাভ করে থাকে। যা তার জন্য একটি উদ্বৃত্ত পাওনা স্বরূপ। যা তাকে সংসারে খরচ করতে হয় না। অথচ পুরুষ মোহরানা প্রদান করে থাকে। যা তার জন্য একটি বিরাট ব্যয় স্বরূপ। এরপরেও তাকে স্ত্রীর ভরণ-পোষণ সহ সংসারের সব খরচ বহন করতে হয়। দেখা যায় যে, মেয়ে যা পায়, তা থেকে যায়। কিন্তু ছেলে নিঃস্ব হয়ে যায়। যেমন ধরুন, পিতা ৩ লক্ষ টাকা রেখে মারা গেলেন। মীরাছ বণ্টনে ছেলে ২ লাখ ও মেয়ে ১ লাখ টাকা পেল। অতঃপর বিয়ের সময় মেয়ে ১ লাখ টাকা মোহরানা পেয়ে ২ লাখ টাকার মালিক হ'ল। অন্যদিকে ছেলে তার বিয়ের সময় মোহরানা ও অন্যান্য বাবদ ২ লাখ টাকা খরচ করায় সে নিঃস্ব হয়ে গেল। এরপরেও তার উপরে রইল সংসার পালনের দায়-দায়িত্ব। (৪) বোন তার ভাইয়ের তুলনায় অর্ধেক পেলেও সে তার মা, দাদা, স্বামী ও বৈপিত্রেয় ভাই এমনকি অবস্থা ভেদে অন্যান্য আত্মীয় থেকেও মীরাছ লাভ করে থাকে। যা একত্রে যোগ করলে ভাইদের তুলনায় বরং বেশী হয়ে যায়। (৫) কন্যা তার মীরাছ নিয়ে স্বামীগৃহে চলে যায়। স্বামীগৃহ তার নিজগৃহ বলে গণ্য হয়। স্বামী ও সন্তানদের উন্নতি ও সমৃদ্ধি তখন তার জীবনে মুখ্য বিষয় হয়। পক্ষান্তরে পুত্র তার পিতার সংসার, সম্মান, ঐতিহ্য ও পিতার আত্মীয়-পরিজন সবকিছুর দায়-দায়িত্ব বহন করে। সেকারণ তাকে কন্যার দ্বিগুণ অংশ দেওয়াটাই ন্যায়বিচার ও বিজ্ঞানসম্মত। (৬) ইসলামী অর্থনীতি পুঁজিবাদী ও সমাজবাদী অর্থনীতির বিপরীত। তাই ইসলামী সমাজে পুঁজি সর্বদা আবর্তনশীল। পুঁজিবাদী সমাজে যেখানে সম্পদ কুক্ষিগত করে রাখার জন্য কন্যাকে বঞ্চিত করে কেবল পুত্রকে উত্তরাধিকার দেওয়া হয়। এমনকি এজন্য দত্তক পুত্র গ্রহণ করে তাকেই উত্তরাধিকারী করা হয় এবং পুত্র একাধিক থাকলে পুঁজি ভেঙ্গে যাবার ভয়ে কেবল জ্যেষ্ঠ পুত্রকে অংশীদার করা হয়। এমনকি 'এজমালি পারিবারিক সম্পত্তি নীতি' গ্রহণ করা হয়। সেখানে ইসলামী সমাজে পুত্র, কন্যা ও অন্যান্য নিকটাত্মীয়কে অংশীদার ও মালিক করে সমাজে পুঁজি ছড়িয়ে দেওয়া হয়। পুঁজিবাদী সমাজে যেখানে মাত্র কিছু ব্যক্তি ও পরিবারের হাতে এবং সমাজবাদী সমাজে কেবল সরকারের হাতে সকল পুঁজি সঞ্চিত হয়, সেখানে ইসলামী সমাজে পুঁজির প্রবাহ সৃষ্টি হয় এবং সর্বত্র রক্ত সঞ্চালনের কারণে সমাজদেহ সুস্থ ও গতিশীল থাকে। কেবল তাই নয়, বরং উত্তরাধিকার বণ্টনের সময় ওয়ারিছগণ ছাড়াও যদি কোন অসহায় আত্মীয়-স্বজন ও ইয়াতীম-মিসকীন এসে হাযির হয়, তাহ'লে তাদেরকেও কিছু দান করা ও তাদের সাথে সদাচরণ করার উপদেশ দেওয়া হয়েছে *(নিসা ৮)*। এর পরেও রয়েছে ফরয যাকাত-ওশর-ফিৎরা ও নফল ছাদাক্বা সমূহের এবং গরীব প্রতিবেশীদের ও অন্যদের প্রতি উদার হস্তে দান করার অবারিত প্রবাহ।

ইসলামী পরিবারে উত্তরাধিকার বণ্টন ইসলামী অর্থনীতির উপরোক্ত কল্যাণময় নীতিমালার আলোকেই গৃহীত হয়েছে, যা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে সরাসরি অবতীর্ণ। আল্লাহ বলেন, এটি হ'ল আল্লাহ্র সীমারেখা। অতএব যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তার রাসূলের আনুগত্য করবে, আল্লাহ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। যার নিম্নদেশ দিয়ে নদীসমূহ প্রবাহিত হয়। সেখানে তারা চিরকাল বাস করবে। আর সেটাই হ'ল মহান সফলতা'। 'পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তার রাসূলের অবাধ্যতা করল এবং তাঁর সীমারেখা সমূহ লংঘন করল, তিনি তাকে জাহান্নামে প্রবেশ করাবেন, যেখানে সে চিরকাল থাকবে এবং তার জন্য থাকবে মর্মান্তিক শাস্তি' *(নিসা ১৪)*।

পরিশেষে আমরা বলব, পবিত্র কুরআনে 'পুরুষ জাতি' নামে কোন সূরা না থাকলেও সূরা নিসা বা 'নারীজাতি' নামে ১৭৬ আয়াত বিশিষ্ট বিরাট একটি সূরা রয়েছে। অতএব এই সূরা না পড়ে অথবা এর অন্তত ৭-৮, ১১-১৪ এবং শেষ আয়াতটি না পড়ে কোন নারী উন্নয়ন নীতিমালা গ্রহণ করা কোন মুসলমানের নিকট কাম্য নয়। বরং আমাদের কাম্য হবে যেন ইসলামের দেওয়া উত্তরাধিকার বণ্টন নীতিমালা সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হয় এবং কোন নারী যেন তার আল্লাহ প্রদত্ত ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত না হয়, সে ব্যাপারে সরকার কঠোরভাবে নযরদারি করবে এবং ইসলামী বিধান সমূহ বাস্তবায়নের মাধ্যমে সমাজে শান্তি ও সমৃদ্ধি নিশ্চিত করবে। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন! আমীন!! *(স.স.)*।

পবিত্র কুরআনে বর্ণিত ২৫ জন নবীর কাহিনী

মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

(২৫/১০ কিস্তি)

২৫. হযরত মুহাম্মাদ
(ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম)

বিজয়োৎসব :

২য় হিজরী সনে রামাযানের ছিয়াম ও যাকাতুল ফিৎর ফরয করা হয়। এছাড়া যাকাতের নিছাব সমূহ বর্ণিত হয়। যা আশ্রিত ও দুস্থ মুসলমানদের জন্য আশীর্বাদ হিসাবে দেখা দেয়। অতঃপর বদর যুদ্ধের কয়েক দিন পরেই ঈদুল ফিৎরের উৎসব পালিত হয়, যা মদীনার মুসলমানদের নিকটে সত্যিকারের বিজয়োৎসবে পরিণত হয়।

কুরআনী বর্ণনা :

বদর যুদ্ধ বিষয়ে সূরা আনফাল নাযিল হয়। উক্ত সূরায় মুসলমানদের দুর্বলতা এবং আল্লাহ্র গায়েবী মদদের কথা যেমন বর্ণিত হয়েছে, তেমনি উক্ত যুদ্ধের মহৎ উদ্দেশ্যের কথাও বর্ণিত হয়েছে। যার দ্বারা জাহেলী যুগের যুদ্ধের সাথে এ যুদ্ধের পার্থক্য স্পষ্ট হয়ে যায়। সেখানে যুদ্ধলব্ধ সম্পদের বণ্টনরীতি যেমন বর্ণিত হয়েছে, তেমনি ইসলাম যে কেবল একটি বিশ্বাসের নাম নয়, বরং একটি বাস্তব রীতি-নীতি সমৃদ্ধ সমাজদর্শনের নাম সেটাও বলে দেওয়া হয়েছে। সেই সাথে ইসলামী খেলাফতের অধীনে বসবাসকারী ও তার বাইরে বসবাসকারী লোকদের মধ্যেকার পার্থক্য ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। অতঃপর আল্লাহ মুসলমানদের প্রতি তাঁর রহমতের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেন,

وَاذْكُرُوْا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيْلٌ مُّسْتَضْعَفُوْنَ فِي الأَرْضِ تَخَافُوْنَ أَنْ يَّتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُــم مِّـــنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ- (الأنفال ٢٦)-

'আর স্মরণ কর যখন তোমরা ছিলে সংখ্যায় অল্প, পৃথিবীতে তোমরা দুর্বল বলে গণ্য হ'তে, তোমরা আশংকা করতে যে, লোকেরা তোমাদের অকস্মাৎ উঠিয়ে নিয়ে যাবে। অতঃপর আল্লাহ তোমাদের আশ্রয় দেন ও তোমাদেরকে নিজ সাহায্য দ্বারা শক্তিশালী করেন এবং তোমাদেরকে উত্তম বস্তু সমূহ জীবিকারূপে দান করেন যাতে তোমরা আল্লাহ্র প্রতি কৃতজ্ঞ হও' *(আনফাল ৮/২৬)*।

বদর যুদ্ধের গুরুত্ব :

(১) এটাই ছিল মুসলমানদের সাথে মুশরিকদের সর্বপ্রথম মুখোমুখি সশস্ত্র সংঘর্ষ। (২) এটি ছিল ইসলামের টিকে থাকা না থাকার ফায়ছালাকারী যুদ্ধ (৩) এটি ছিল হক ও বাতিলের পার্থক্যকারী অথচ একটি অসম যুদ্ধ। কেননা একটি সুসজ্জিত এবং সংখ্যায় তিনগুণ অধিক ও প্রশিক্ষিত সেনাদলের সাথে অপ্রস্তুত, অসজ্জিত এবং সংখ্যায় তিনগুণ কম এবং বাস্তুভিটা হারা মুহাজির ও নওমুসলিম আনছারদের এ যুদ্ধে জয় লাভ ছিল এক অকল্পনীয় ব্যাপার। এ কারণেই এ যুদ্ধের দিনটিকে পবিত্র কুরআনে 'ইয়াওমুল ফুরক্বান' বা কুফর ও ইসলামের মধ্যে 'ফায়ছালাকারী দিন' *(আনফাল ৮/৪১)* বলে অভিহিত করা হয়েছে । (৪) বদরের এ দিনটিকে আল্লাহ স্মরণীয় হিসাবে উল্লেখ করে বলেন, وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللهُ بِبَدْرٍ وَأَنْــتُمْ أَذِلَّـــةٌ فَاتَّقُوْا اللهَ لَعَلَّكُمْ تَـــشْكُرُوْنَ- 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের সাহায্য করেছেন বদরের যুদ্ধে। অথচ তোমরা ছিলে দুর্বল। অতএব আল্লাহকে ভয় কর যাতে তোমরা কৃতজ্ঞ হ'তে পার' *(আলে ইমরান ৩/১২৩)*। উল্লেখ্য যে, 'বদর' নামটি কুরআনে মাত্র একটি স্থানেই উল্লেখিত হয়েছে। (৫) বদরের যুদ্ধ ছিল কাফেরদের মূল কর্তনকারী ও সত্যকে প্রতিষ্ঠা দানকারী। এ যুদ্ধের পরে কাফের সমাজে এমন আতংক প্রবেশ করে যে, তারা আর কখনো বিজয়ের মুখ দেখেনি। যেমন আল্লাহ বলেন, وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللهُ إِحْــدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّوْنَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُــوْنُ لَكُمْ وَيُرِيْدُ اللهُ أَنْ يُّحِقَّ الحَقَّ بِكَلِمَاتِــهِ وَيَقْطَــعَ دَابِــرَ الْكَافِرِيْنَ- لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِــلَ الْبَاطِــلَ وَلَــوْ كَــرِهَ الْمُجْرِمُــوْنَ- 'আর যখন আল্লাহ দু'টি দলের একটির ব্যাপারে তোমাদের সাথে ওয়াদা করেছিলেন যে, সেটি তোমাদের হস্তগত হবে আর তোমরা কামনা করছিলে যাতে কোনরূপ কণ্টক ছাড়াই সেটা তোমাদের হাতে আসে। অথচ আল্লাহ চাইতেন সত্যকে স্বীয় কালামের মাধ্যমে সত্যে পরিণত করতে এবং কাফেরদের মূল কর্তন করে দিতে'। 'যাতে করে তিনি সত্যকে সত্য এবং মিথ্যাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে দেন, যদিও পাপীরা তাতে নাখোশ হয়' *(আনফাল ৮/৭-৮)*। (৬) এ যুদ্ধে বিজয়ের ফলে মুসলমানদের শক্তি ও সাহস বৃদ্ধি পায়। দলে দলে লোকেরা ইসলামে প্রবেশ করতে থাকে। এমনকি মুনাফিক নেতা আব্দুল্লাহ প্রকাশ্যে ইসলাম কবুলে বাধ্য হয়। শত্রুরা ভীত হয়ে চুপসে যায়। (৭) বদরের যুদ্ধের বিজয় ছিল মক্কা বিজয়ের সোপান স্বরূপ। এই সময় শা'বান মাস থেকে কা'বার দিকে কিবলা পরিবর্তিত হয় এবং বদর যুদ্ধের মাত্র

ছয় বছর পরেই ৮ম হিজরীর ১৭ই রামাযান তারিখে মক্কা বিজয়ের মাধ্যমে যা পূর্ণতা লাভ করে।

শিক্ষণীয় বিষয় সমূহ- ২২

(১) মক্কায় পরিবেশ প্রতিকূলে থাকায় সেখানে সশস্ত্র যুদ্ধের অনুমতি দেওয়া হয়নি। পক্ষান্তরে মদীনায় পরিবেশ অনুকূলে থাকায় এবং এখানে সবাই রাসূলের নেতৃত্ব মেনে নিতে মৌখিক ও লিখিতভাবে অঙ্গীকারাবদ্ধ হওয়ার ফলে মুসলমানেরা চালকের আসনে থাকায় রাসূলকে সশস্ত্র যুদ্ধের অনুমতি দেওয়া হয়। এতে বুঝা যায় যে, বিজয়ের সম্ভাবনা ও পরিবেশ না থাকলে যুদ্ধের ঝুঁকি না নিয়ে ছবর করতে হবে। যেমনটি মাক্কী জীবনে করা হয়েছিল।

(২) বদরের যুদ্ধ ছিল মূলতঃ আত্মরক্ষামূলক। আবূ জাহলকে বদরে মুকাবিলা না করলে সে সরাসরি মদীনায় হামলা করার দুঃসাহস দেখাত। যা ইতিপূর্বে তাদের একজন নেতা কূরয বিন জাবের ফিহরী সরাসরি মদীনার উপকণ্ঠে হামলা করে গবাদিপশু লুটে নেবার মাধ্যমে জানিয়ে গিয়েছিল। এতে বুঝা যায় যে, আত্মরক্ষা এবং ইসলামের স্বার্থ ব্যতীত অন্য কোন কারণে কাফেরদের সাথে সশস্ত্র যুদ্ধের অনুমতি নেই।

(৩) সংখ্যা ও যুদ্ধ সরঞ্জামের কমবেশী বিজয়ের মাপকাঠি নয়। বরং আল্লাহ্র উপরে দৃঢ় ঈমান ও তাওয়াক্কুল হ'ল বিজয়ের মূল হাতিয়ার। পরামর্শ সভায় কয়েকজন ছাহাবী বাস্তব অবস্থার প্রেক্ষিতে যুদ্ধ না করে ফিরে যাবার পরামর্শ দিলে আল্লাহ ধমক দিয়ে আয়াত নাযিল করেন *(আনফাল ৮/৫-৬)*। এতে বুঝা যায়, আল্লাহ্র গায়েবী মদদ লাভই হ'ল বড় বিষয়।

(৪) যুদ্ধের উদ্দেশ্য হ'তে হবে জান্নাত লাভ। যেটা যুদ্ধ শুরুর প্রথম নির্দেশেই আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) ছাহাবীগণের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন। অতএব চিন্তাক্ষেত্রের যুদ্ধ হৌক বা সশস্ত্র মুকাবিলা হৌক ইসলামের সৈনিকদের একমাত্র লক্ষ্য থাকতে হবে জান্নাত লাভ। কোন অবস্থাতেই দুনিয়া হাছিলের জন্য মুসলমানের চিন্তাশক্তি বা অস্ত্র শক্তি ব্যয়িত হবে না।

(৫) স্রেফ আল্লাহ্র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে যুদ্ধে নামলে আল্লাহ স্বীয় ফেরেশতা মণ্ডলী পাঠিয়ে সরাসরি সাহায্য করে থাকেন। যেমন বদর যুদ্ধের শুরুতে রাসূলের বালু নিক্ষেপের মাধ্যমে *(আনফাল ৮/১৭)* অতঃপর ফেরেশতাদের সরাসরি যুদ্ধে অংশগ্রহণের মাধ্যমে সাহায্য করা হয়েছিল *(আনফাল ৮/৯)*।

(৬) যুদ্ধে গনীমত লাভের মাধ্যমে দুনিয়া অর্জিত হ'লেও তা কখনোই মুখ্য হবে না। বরং সর্বাবস্থায় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও তাঁর নির্দেশ অনুযায়ী সেনাপতির অনুগত থাকতে হবে। বদর যুদ্ধে গনীমত বণ্টন নিয়ে বিবাদ উপস্থিত হ'লেও তা সাথে সাথে নিষ্পত্তি হয়ে যায় রাসূলের নির্দেশে এবং আয়াত নাযিলের মাধ্যমে *(আনফাল ৮/১)*।

(৭) কাফিররা মুসলমানদের সংখ্যা ও অস্ত্র শক্তিকে ভয় পায় না। বরং তারা ভয় পায় মুসলমানের ঈমানী শক্তিকে। বদরের যুদ্ধের পরে সে ভয় সমস্ত কুফরী শক্তিকে গ্রাস করেছিল। এ কারণেই পরবর্তী ওহোদের যুদ্ধে তারা মহিলাদের সাথে করে এনেছিল। যাতে পুরুষেরা যুদ্ধের ময়দান ছেড়ে না পালায়।

(৮) বদর যুদ্ধের বড় শিক্ষা এই যে, কুফর ও ইসলামের মুকাবিলায় মুসলমান নিজের সীমিত শক্তি নিয়ে আল্লাহ্র উপরে তাওয়াক্কুল করে ঝাঁপিয়ে পড়বে। আর এভাবেই চিরকাল ঈমানদার সংখ্যালঘু শক্তি বেঈমান সংখ্যাগুরু শক্তির উপরে বিজয়ী হয়ে থাকে *(বাক্বারাহ ২/২৪৯)*। এ ধারা ক্বিয়ামত পর্যন্ত জারি থাকবে।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যুদ্ধ ও অভিযান সমূহ

(১ম হিজরীর রামাযান হ'তে ১১ হিজরীর ছফর পর্যন্ত)

১। সারিইয়াতু সীফিল বাহর (سرية سيف البحر)**:** মদীনায় হিজরতের ৭ মাসের মাথায় ১ম হিজরীর রামাযান মোতাবেক ৬২৩ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসে হামযাহ বিন আব্দুল মুত্ত্বালিবের নেতৃত্বে ৩০ জনের মুহাজির বাহিনী। প্রতিপক্ষে ছিল আবু জাহলের নেতৃত্বে ৩০০ জনের একটি সিরিয়া ফেরত বাণিজ্য কাফেলা। লোহিত সাগরের তীরবর্তী 'ঈছ' (العيص) নামক স্থানে মুখোমুখি হ'লেও যুদ্ধ হয়নি। উল্লেখ্য যে, ইতিপূর্বে যুদ্ধের অনুমতি দিয়ে সূরা হজ্জ ৩৯ আয়াতটি নাযিল হয়।

২। সারিইয়াতু রাবেগ (سرية رابغ) **:** ১ম হিজরীর শাওয়াল মাসে। ওবায়দাহ ইবনুল হারেছ ইবনুল মুত্ত্বালিব-এর নেতৃত্বে ৬০ জনের মুহাজির বাহিনী। প্রতিপক্ষ আবু সুফিয়ানের নেতৃত্বে ২০০ জনের বাণিজ্য কাফেলা। রাবেগ নামক স্থানে উভয় পক্ষের মুকাবিলায় কিছু তীর নিক্ষেপ ব্যতীত আর কিছু হয়নি। তবে মাক্কী বাহিনীতে লুকিয়ে থাকা দু'জন মুসলমান মিক্বদাদ বিন আমর বুহরানী এবং উৎবাহ বিন গাযওয়ান মাযেনী মুসলিম বাহিনীর সাথে এসে মিলিত হন।

৩। সারিইয়াতুল খাররার (سرية الخرار) **:** ১ম হিজরীর যুলক্বা'দাহ মাসে। সা'দ ইবনু আবী ওয়াক্কাছের নেতৃত্বে জুহফার নিকটবর্তী খাররার নামক স্থানে ২০ জনের

মুহাজির বাহিনী প্রেরিত হয়। কিন্তু কুরায়েশ বাণিজ্য কাফেলা আগের দিন চলে যাওয়ায় সাক্ষাৎ মেলেনি।

৪। গাযওয়া ওয়াদ্দান (غـــزوة ودَّان) : ২য় হিজরীর ছফর মাসে (৬২৩ খৃঃ আগষ্ট মাস) রাসূল (ছাঃ)-এর নেতৃত্বে একটি কুরায়েশ কাফেলার বিরুদ্ধে পরিচালিত ৭০ জনের মুহাজির বাহিনী। যুদ্ধ হয়নি। তবে স্থানীয় বনু যামরাহ গোত্রের সাথে সন্ধিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এটাই ছিল রাসূলের জীবনে প্রথম যুদ্ধাভিযান। এই সফরে তিনি ১৫ দিন অতিবাহিত করেন। পতাকাবাহী ছিলেন হামযাহ (রাঃ)।

৫। গাযওয়া বুওয়াত্ব (غزوة بواط) : ২য় হিজরীর রবীউল আউয়াল মাসে রাসূলের নেতৃত্বে ২০০ জনের বাহিনী। প্রতিপক্ষে ছিল উমাইয়া বিন খালাফের নেতৃত্বে ১০০ জনের একটি বাণিজ্য কাফেলা। যাতে ছিল ২৫০০ উট। সংঘর্ষ হয়নি।

৬। গাযওয়া সাফওয়ান (غـــزوة ســـفوان) : ২য় হিজরীর রবীউল আউয়াল মাসে মোতাবেক ৬২৩ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে রাসূলের নেতৃত্বে ৭০ জনের দল। প্রতিপক্ষ মক্কার নেতা কুরয বিন জাবের আল-ফিহরী পালিয়ে যায়। সে ছিল মদীনার উপকণ্ঠে প্রথম হামলাকারী এবং গবাদি-পশু লুটকারী। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এই লুটেরাদের ধাওয়া করে বদরের উপকণ্ঠে সাফওয়ান উপত্যকা পর্যন্ত গমন করেন। এজন্য এই অভিযানকে গাযওয়া বদরে ঊলা বা প্রথম বদর যুদ্ধ বলা হয়।

৭। গাযওয়া যিল উশাইরাহ (غزوة ذي العـــشيرة) : ২য় হিজরীর জুমাদাল ঊলা ও আখেরাহ মোতাবেক ৬২৩ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর ও ডিসেম্বর মাসে রাসূলের নেতৃত্বে ১৫০/২০০ লোকের বাহিনী। সিরিয়া যাত্রী কুরায়েশ কাফেলা নাগালের বাইরে চলে যায়। এই কাফেলাটিকে মক্কায় ফেরার পথে আটকানোর জন্য রামাযানের ৮ অথবা ১২ তারিখে আল্লাহ্র রাসূল মদীনা থেকে বের হন, যা পরে বদর যুদ্ধের প্রত্যক্ষ কারণ হিসাবে গণ্য হয়। এই অভিযানে বনু মুদলিজ ও তাদের মিত্র বনু যামরাহ্র সাথে 'যুদ্ধ নয়' চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

৮। সারিইয়াহ নাখলা (ســـرية نخلـــة): ২য় হিজরীর রজব মাসে। আব্দুল্লাহ বিন জাহশের নেতৃত্বে মাত্র ১২ জনের একটি ছোট্ট দল। কুরায়েশ পক্ষের বাণিজ্য কাফেলার নেতা আমর ইবনুল হাযরামী নিহত ও ২ জন বন্দী হয়। এটাই ছিল ইসলামে প্রথম নিহত ও প্রথম দুই বন্দী। গনীমতের মালামাল সহ মদীনায় প্রত্যাবর্তন। কিন্তু হারাম মাসের শেষ দিন হওয়ায় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) রক্তমূল্য দেন এবং বন্দীদের মুক্তি দেন। এ প্রসঙ্গে বাক্বারাহ ২১৭ আয়াত নাযিল হয়। যাতে বলা হয় যে, হারাম মাসে যুদ্ধ করা অন্যায়। তবে আল্লাহ্র পথে বাধা দান ও মসজিদুল হারামে যেতে বাধা দান এবং তার বাসিন্দাদের বহিষ্কার করা আল্লাহ্র নিকটে তদপেক্ষা বড় অন্যায়। এই যুদ্ধে নিহতের বদলা নিতেই আবু জাহল বদরে এসেছিল। এই অভিযান শেষে শা'বান মাসে মুসলমানদের উপরে জিহাদ ফরয হয় *(বাক্বারাহ ২/১৯০-৯৩; মুহাম্মাদ ৪৭/৪-৭, ২০)*।

৯। গাযওয়ায়ে বদর (غزوة بدر الكـــبرى) : ২য় হিজরীর ১৭ রামাযান মোতাবেক ৬২৪ খৃষ্টাব্দের ১১ মার্চ শুক্রবার। রাসূল (ছাঃ)-এর নেতৃত্বে ৩১৩, ১৪ বা ১৭ জনের অপ্রস্তুত বাহিনী। কুরায়েশ পক্ষে আবু জাহলের নেতৃত্বে ১০০০ লোকের সুসজ্জিত বাহিনী। মুসলিম পক্ষে ৬ জন মুহাজির ও ৮ জন আনছার সহ ১৪ জন শহীদ এবং কুরায়েশ পক্ষে ৭০ জন নিহত ও ৭০ জন বন্দী হয়। আবু জাহল সহ নিহতদের অধিকাংশ ছিল মক্কার শীর্ষ নেতৃবৃন্দ। বদর যুদ্ধ উপলক্ষে সূরা আনফাল নাযিল হয়। যাতে গনীমতের বিধান বর্ণিত হয়।

১০। সারিইয়াহ ওমায়ের ইবনুল আদী আল-খুত্বামী (عمير بـــن العـــدي الخطمـــى) : ২য় হিজরীর রামাযান মাসে। একাকী স্বীয় সম্পর্কিত বোন আছমা (عـــصماء) বিনতে মারোয়ান খুত্বামিয়াকে হত্যা করেন। কেননা মহিলাটি সর্বদা তার গোত্রকে রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য প্ররোচনা দিত। ওমায়ের ছিলেন তার গোত্রের প্রধান এবং সর্বপ্রথম ইসলাম কবুলকারী। তার পিতা আদী বিন খারশাহ একজন প্রসিদ্ধ কবি ছিলেন।

১১। সারিইয়াহ সালেম বিন ওমায়ের আনছারী (سالم بـــن عمـــير) : ২য় হিজরীর শাওয়াল মাসে। একাকী জনৈক ইহুদী আবু ওকফা (ابوعكفه)-কে হত্যা করেন। কারণ সে সর্বদা অন্য ইহুদীদেরকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের উস্কানী দিত।

১২। গাযওয়া বনু সুলায়েম (غـــزوة بـــني ســـليم) : ২য় হিজরীর শাওয়াল মাসে বদর যুদ্ধ হ'তে প্রত্যাবর্তনের মাত্র সাতদিন পরে সংঘটিত হয়। বনু গাত্বফান গোত্রের শাখা বনু সুলায়েম মদীনা হামলার প্রস্তুতি নিচ্ছে জানতে পেরেই আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) স্বয়ং ২০০ উষ্ট্রারোহীকে নিয়ে মক্কা ও সিরিয়ার বাণিজ্যপথে কুদর (الكـــدر) নামক ঝর্ণাধারার নিকটে পৌঁছে তাদের উপরে আকস্মিক হামলা চালান। তারা হতবুদ্ধি হয়ে ৫০০ উট রেখে পালিয়ে যায়। ইয়াসার

(يسار) নামে একটি গোলাম আটক হয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে মুক্ত করে দেন।

১৩। গাযওয়া বনু কায়নুক্বা (غزوة بني قينقاع) : ২য় হিজরীর ১৫ই শাওয়াল শনিবার থেকে ১৫ দিন অবরোধ করে রাখার পর এই প্রথম চুক্তি ভঙ্গকারী এবং তাদের বাজারে এক দুধ বিক্রেতা মুসলিম মহিলাকে বিবস্ত্রকারী এই নরাধম ইহুদী গোত্রটি ১লা যিলক্বা'দ আত্মসমর্পণ করে। এরা ছিল খায়বার গোত্রের মিত্র। ফলে মাত্র একমাস পূর্বে ইসলাম কবুলকারী খাযরাজ গোত্রভুক্ত মুনাফিক নেতা আব্দুল্লাহ বিন উবাইয়ের একান্ত অনুরোধ ও পীড়াপীড়িতে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) তাদের প্রাণদণ্ড মওকুফ করে মদীনা থেকে বহিষ্কারের নির্দেশ দেন। এদের মধ্যে ৭০০ জন ছিল সশস্ত্র যোদ্ধা এবং মদীনার সেরা ইহুদী বীর। এরা সবকিছু ফেলে সিরিয়ার দিকে চলে যায় এবং অল্পদিনের মধ্যেই তাদের অধিকাংশ সেখানে মৃত্যুবরণ করে। মানছূরপুরী বলেন, তারা খায়বরে যেয়ে বসতি স্থাপন করে।[১]

১৪। গাযওয়া সাভীক্ব (غزوة سويق) : ২য় হিজরীর যিলহাজ্জ মাসে। বদর যুদ্ধের মন্দ পরিণতিতে কুরায়েশ নেতা আবু সুফিয়ান শপথ করেছিলেন যে, মুহাম্মাদের সঙ্গে যুদ্ধ করে এর প্রতিশোধ না নেওয়া পর্যন্ত তার মস্তক নাপাকীর গোসলের পানি স্পর্শ করবে না। সেই প্রতিজ্ঞা পূরণের জন্য তিনি ২০০ অশ্বারোহী নিয়ে মদীনায় এসে ইহুদী গোত্র বনু নাযীর নেতা ও তাদের কোষাধ্যক্ষ সালাম বিন মুশকিমের সঙ্গে শলা পরামর্শ শেষে ফিরে যান। কিন্তু যাওয়ার আগে একটি দল পাঠিয়ে দেন। যারা মদীনার আরীয (العريض) নামক স্থানে হামলা করে কয়েক সারি খেজুর গাছ কেটে জ্বালিয়ে দেয় এবং একজন আনছার ও তার এক মিত্রকে তাদের জমিতে কর্মরত পেয়ে হত্যা করে ফিরে যায়।

এখবর জানতে পেরে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) দ্রুত গতিতে পশ্চাদ্ধাবন করেন। আবু সুফিয়ান ভয়ে এত দ্রুত পলায়ন করেন যে, বোঝা হালকা করার জন্য তাদের পাথেয় সম্ভার এবং ছাতুর অনেকগুলি বস্তা রাস্তায় ফেলে দেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ক্বারক্বারাতুল কুদর (قرقرة الكدر) পর্যন্ত ধাওয়া করে ফিরবার পথে তাদের ফেলে যাওয়া ছাতুর বস্তাগুলো নিয়ে আসেন। ছাতুকে আরবীতে 'সাভীক্ব' (السويق) বলা হয়। সেজন্য এই অভিযানটি 'গাযওয়া সাভীক্ব' বা ছাতুর যুদ্ধ নামে পরিচিত হয়েছে।

১৫। সারিইয়া গালিব বিন আব্দুল্লাহ লায়ছী (سرية غالب بن عبد الله الليثي) : ২য় হিজরীর শাওয়াল মাসে আগ্রাসী বনু সুলায়েম বাহিনীকে তাড়িয়ে দিয়ে সেখানে তিন দিন অবস্থান শেষে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মদীনায় ফিরে আসার পর শত্রুরা পুনরায় সংগঠিত হয়েছিল। তখন এদের বিরুদ্ধে পুনরায় এই অভিযান প্রেরিত হয়। যাতে শত্রুপক্ষের কয়েকজন এবং মুসলিম পক্ষের তিন জন মারা যায়।

১৬। গাযওয়া যী আমর (غزوة ذي أمر) : ৩য় হিজরীর ছফর মাস। বনু ছা'লাবাহ ও বনু মুহারিব গোত্রদ্বয় বিরাট এক বাহিনী নিয়ে মদীনা আক্রমন করবে এ মর্মে খবর পেয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ৪০০ সৈন্য নিয়ে তাদের মুকাবিলায় বের হন। পথিমধ্যে বনু ছা'লাবাহ গোত্রের জাব্বার (جبار) নামক জনৈক ব্যক্তি গ্রেফতার হয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে ইসলামের দাওয়াত দিলে সে মুসলমান হয়ে যায় এবং মুসলিম বাহিনীর পথপ্রদর্শক হিসাবে কাজ করে। শত্রুপক্ষ পালিয়ে যায়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাদের ঘাঁটি এলাকায় পৌঁছে যী আমর (ذي أمر) নামক ঝর্ণাধারার পাশে অবস্থান গ্রহণ করেন। তিনি সেখানে পুরা ছফর মাস অতিবাহিত করেন। যাতে মুসলিম শক্তির প্রভাব ও প্রতিপত্তি শত্রুদের অন্তরে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়।

১৭। সারিইয়া মুহাম্মাদ বিন মাসলামাহ : ৩য় হিজরীর ১৪ রবীউল আউয়াল। মদীনার নামকরা ইহুদী পুঁজিপতি ও কবি কা'ব বিন আশরাফ সর্বদা মুসলমানদের বিরুদ্ধে ইহুদীদেরকে যুদ্ধে প্ররোচনা দিত। বদর যুদ্ধের পর সে মক্কায় গিয়ে কুরায়েশ নেতাদের উস্কে দেয়। তারপর মদীনায় ফিরে এসে ছাহাবায়ে কেরামের স্ত্রীদের নামে কুৎসা গেয়ে কবিতা বলতে থাকে। তাতে অতিষ্ঠ হয়ে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) তাকে হত্যার নির্দেশ দেন। সেমতে আউস গোত্রের মুহাম্মাদ বিন মাসলামাহ্র নেতৃত্বে পাঁচজনের একটি দল ১৪ই রবীউল আউয়াল চাঁদনী রাতে তার বাড়ী গিয়ে তাকে হত্যা করে। এই ঘটনার পর ইহুদীরা সম্পূর্ণরূপে হিম্মত হারিয়ে ফেলে এবং রাসূলের সাথে পূর্বের কৃত চুক্তি মোতাবেক আচরণ করার স্বীকৃতি প্রদান করে। এর ফলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আভ্যন্তরীণ গোলযোগের আশংকা হ'তে মুক্ত হন এবং বহিরাক্রমণ মুকাবিলার দিকে মনোযোগ দেওয়ার সুযোগ পান।

১৮। গাযওয়া বাহরান (غزوة بحران) : ৩য় হিজরীর রবীউল আখের মাসে। একটি কুরায়েশ বাণিজ্য কাফেলাকে আটকানোর জন্য আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) ৩০০ সৈন্য নিয়ে হেজাযের ফারা (الفرع) সীমান্তের বাহরান অঞ্চলে গমন

১. *রহমাতুল লিল আলামীন ১/১৩০।*

করেন। সেখানে তিনি রবীউল আখের ও জুমাদাল উলা দু'মাস অবস্থান করেন। কিন্তু কোন যুদ্ধ হয়নি।

১৯। সারিইয়া যায়েদ ইবনু হারেছাহ : ৩য় হিজরীর জুমাদাল আখেরাহ। মদীনার পথে ব্যবসায়ের প্রতিবন্ধকতার কথা ভেবে কুরায়েশ বাণিজ্য কাফেলা মদীনার পূর্বদিক দিয়ে দীর্ঘ পথ ঘুরে সম্পূর্ণ অজানা পথে নাজদ হয়ে সিরিয়া যাবার মনস্থ করে। এ খবর মদীনায় পৌঁছে গেলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যায়েদ বিন হারেছাহ্র নেতৃত্বে ১০০ জনের একটি অশ্বারোহী দল প্রেরণ করেন। তারা অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে অগ্রসর হয়ে 'ক্বারদাহ' (قردة) নামক প্রস্রবণের কাছে পৌঁছে তাদের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়েন। অতর্কিতে এই হামলার মুকাবিলায় ব্যর্থ হয়ে কাফেলা নেতা ছাফওয়ান বিন উমাইয়া সবকিছু ফেলে পালিয়ে যান। কুরায়েশদের পথ প্রদর্শক ফুরাত বিন হাইয়ান (فرات بن حيان) এবং বর্ণিত হয়েছে যে, আরও দু'জন বন্দী হয়ে মদীনায় নীত হয়। অতঃপর তারা রাসূলের হাতে বায়'আত করে ইসলাম কবুল করেন। আনুমানিক এক লক্ষ দেরহামের রৌপ্য সহ বিপুল পরিমাণ গনীমতের মাল হস্তগত হয়। এই পরাজয়ে কুরায়েশরা হতাশ হয়ে পড়ে। এখন তাদের সামনে মাত্র দু'টি পথই খোলা রইল। অহংকার পরিত্যাগ করে মুসলমানদের সাথে সন্ধি করা অথবা যুদ্ধের মাধ্যমে হৃত গৌরব পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করা। বলা বাহুল্য, তারা শেষটাই গ্রহণ করে এবং যা ওহোদ যুদ্ধকে অনিবার্য করে তোলে।

২০। গাযওয়া ওহোদ (غزوة الأحد) : ৩য় হিজরীর ৭ই শাওয়াল শনিবার সকাল। কুরায়েশ বাহিনী আবু সুফিয়ানের নেতৃত্বে ৩০০০ সৈন্যের সুসজ্জিত বাহিনী নিয়ে মদীনার তিন মাইল উত্তরে ওহোদ পাহাড়ের পাদদেশে শিবির সন্নিবেশ করে। এই বাহিনীর সাথে আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দ বিনতে ওৎবার নেতৃত্বে ১৫ জনের একদল মহিলা ছিল, যারা নেচে-গেয়ে ও উত্তেজক কবিতা পাঠ করে তাদের সৈন্যদের উৎসাহিত করে। এই যুদ্ধে রাসূলের নেতৃত্বে প্রায় ৭০০ সৈন্য ছিলেন। প্রচণ্ড যুদ্ধ শেষে একটি ভুলের জন্য মুসলমানদের সাক্ষাৎ বিজয় অবশেষে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। মুসলিম পক্ষে ৭০ জন শহীদ ও ৪০ জন আহত হন। কুরায়েশ পক্ষে ৩৭ জন নিহত হয়। যাদের মধ্যে হামযা একাই ৩১ জনকে হত্যা করেন ও নিজে শহীদ হন। মুসলমানদের ক্ষতি হ'লেও কুরায়েশরা বিজয়ী হয়নি। বরং তারা ভীত হয়ে ফিরে যায়। এই যুদ্ধ প্রসঙ্গে সূরা আলে ইমরানের ১২১-১৭৯ পর্যন্ত ৬০টি আয়াত নাযিল হয়।

২১। গাযওয়া হামরাউল আসাদ (غزوة حمراء الأسد) : ৩য় হিজরীর ৮ই শাওয়াল। আবু সুফিয়ানের বাহিনী পুনরায় মদীনা আক্রমণ করতে পারে, এই আশংকায় ওহোদ যুদ্ধের পরদিনই তাদের পশ্চাদ্ধাবন করা হয়। মদীনা থেকে ৮ মাইল দূরে হামরাউল আসাদে পৌঁছে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) সেখানে তিনদিন অবস্থান করেন। সেখানে মা'বাদ আল-খুযাঈ ইসলাম কবুল করলে তাকে পাঠানো হয় আবু সুফিয়ানের কাছে। মক্কার পথে 'রাওহা' নামক স্থানে পৌঁছে আবু সুফিয়ান পুনরায় মদীনা আক্রমণের অভিসন্ধি করেছিল। কিন্তু মা'বাদের কূটনীতিতে এবং মুসলিম বাহিনীর পশ্চাদ্ধাবনের কথা শুনে তারা ভীত হয়ে দ্রুত মক্কায় ফিরে যায়। মুসলিম বাহিনী নিরাপদে মদীনায় ফিরে আসে। এ ঘটনা বর্ণিত হয়েছে সূরা আলে ইমরান ১৭৩-৭৪ আয়াতে। এ সময় হামরাউল আসাদে আবু সুফিয়ানের দু'জন গুপ্তচর আবু উযযা জামহী ও মু'আবিয়া বিন মুগীরা গ্রেফতার হয় ও পরে নিহত হয়। শেষোক্ত ব্যক্তি ছিল পরবর্তীতে উমাইয়া খলীফা আব্দুল মালিক বিন মারওয়ানের নানা।

২২। সারিইয়া আবু সালামা (سرية أبي سلمة) : ৪র্থ হিজরীর ১লা মুহাররম। ত্বালহা ও সালামা বিন খুওয়াইলিদ নামক দুই কুখ্যাত ডাকাত ভাই বনু আসাদ গোত্রকে মদীনা আক্রমণের প্ররোচনা দিচ্ছে মর্মে খবর পৌঁছলে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) স্বীয় দুধভাই আবু সালামাহ (রাঃ)-এর নেতৃত্বে মুহাজির ও আনছারের ১৫০ জনের একটি সেনাদল প্রেরণ করেন। বনু আসাদের প্রস্তুতি গ্রহণের পূর্বেই তাদের 'কুত্বন' (القطن) নামক ঘাঁটিতে অতর্কিত আক্রমণের ফলে তারা হতচকিত হয়ে পালিয়ে যায়। মুসলিম বাহিনী তাদের ফেলে যাওয়া উট ও বকরীর পাল ও গনীমতের মাল নিয়ে ফিরে আসে। এই যুদ্ধ থেকে ফিরে কিছু দিনের মধ্যে আবু সালামা মৃত্যুবরণ করেন। অতঃপর তার বিধবা স্ত্রী উম্মে সালামা রাসূলের সাথে বিবাহিতা হন। আবু সালামা ইতিপূর্বে ওহোদের যুদ্ধে যখমী হয়েছিলেন।

২৩। সারিয়াহ আব্দুল্লাহ বিন আনীস (سرية عبد الله بن أنيس): ৪র্থ হিজরীর ৫ই মুহাররম। মুসলমানদের উপরে হামলার জন্য খালেদ বিন সুফিয়ান হুযালী সৈন্য সংগ্রহ করছে বলে সংবাদ পেয়ে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) আব্দুল্লাহ বিন আনীস আল-জুহানী আনছারীকে তার বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। তিনি সেখানে গিয়ে ১৮ দিন অবস্থান করেন এবং অবশেষে খালেদকে হত্যা করে তার মাথা নিয়ে মদীনায় ফেরেন।

২৪। সারিইয়া রাজী' (سرية رجيع) : ৪র্থ হিজরীর ছফর মাস। কুরায়েশরা ষড়যন্ত্র করে আযাল ও ক্বারাহ (عضل وقارة) গোত্রের সাতজন লোককে রাসূলের দরবারে পাঠায়। তারা গিয়ে আরয করে যে, আমাদের গোত্রের মধ্যে ইসলামের কিছু চর্চা রয়েছে। এক্ষণে তাদের অধিক

তা'লীমের প্রয়োজন। সেকারণ কয়েকজন উঁচু মর্তবার ছাহাবীকে পাঠালে আমরা উপকৃত হ'তাম। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সরল বিশ্বাসে তাদের গোত্রে আছেম বিন ছাবিতের নেতৃত্বে ১০ জন বুযর্গ ছাহাবীকে প্রেরণ করেন। আছেম হযরত ওমরের শ্বশুর ছিলেন এবং আছেম বিন ওমরের নানা ছিলেন। তারা রাবেগ ও জেদ্দার মধ্যবর্তী 'রাজী' নামক প্রস্রবণের নিকটে পৌঁছলে পূর্ব পরিকল্পনা মতে হুযায়েল গোত্রের শাখা বনু লেহিয়ানের ১০০ তীরন্দায তাদেরকে হামলা করে। যুদ্ধে আছেম সহ আটজন শহীদ হন এবং দু'জনকে তারা মক্কায় নিয়ে বিক্রি করে দেয়। তারা হ'লেন হযরত খোবায়েব বিন আদী ও যায়েদ বিন দাছনা। সেখানে ওকবা বিন হারেছ খোবায়েবকে এবং ছাফওয়ান বিন উমাইয়া যায়েদকে হত্যা করে বদর যুদ্ধে তাদের স্ব স্ব পিতৃহত্যার বদলা হিসাবে। শূলে চড়ার আগে খোবায়েব দু'রাক'আত নফল ছালাত আদায় করেন এবং বলেন, আমি ভীত হয়েছি এই অপবাদ তোমরা না দিলে আমি দীর্ঘক্ষণ ছালাত আদায় করতাম। তিনিই প্রথম এই সুন্নাতের সূচনা করেন। অতঃপর কাফেরদের বদ দো'আ করেন এবং সাত লাইনের মর্মন্তুদ কবিতা বলেন, যা ছহীহ বুখারী সহ বিভিন্ন হাদীছ ও জীবনী গ্রন্থে উল্লেখিত হয়েছে। খোবায়েবের বদ দো'আ ছিল নিম্নরূপ- اَللّٰهُمَّ أَحْصِهِمْ عَدَدًا وَاقْتُلْهُمْ بَدَدًا وَلاَ تُبْقِ مِنْهُمْ أَحَدًا– 'হে আল্লাহ! তুমি এদেরকে এক এক করে গুণে রাখ। তাদেরকে এক এক করে হত্যা কর এবং এদের একজনকেও বাকী রেখো না'। অতঃপর তাঁর সাত লাইনের কবিতার শেষের দু'লাইন ছিল নিম্নরূপ-

ولست أبالى حين أقتل مسلما + على أي شق كان فى لله مصرعي

وذلك في ذات الاله وإن يشاء + يبارك في أوصال شلو ممزع

'আমি যখন মুসলিম হিসাবে নিহত হই তখন আমি কোন পরোয়া করি না যে, আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য আমাকে কোন্ পার্শ্বে শোয়ানো হচ্ছে'। 'আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্যই আমার মৃত্যু হচ্ছে। তিনি ইচ্ছা করলে আমার খণ্ডিত টুকরা সমূহে বরকত দান করতে পারেন'।[২] এরপর আবু সুফিয়ান তাকে বললেন, যে তুমি কি এটাতে খুশী হবে যে, তোমার স্থলে আমরা মুহাম্মাদকে হত্যা করি এবং তুমি তোমার পরিবার সহ বেঁচে থাক? তিনি বলেন, আল্লাহ্র কসম! আমি চাই না যে, আমার স্থলে মুহাম্মাদ আসুক এবং তাকে একটি কাটারও আঘাত লাগুক'। হারাম থেকে দূরে তানঈম নামক স্থানে তাকে হত্যা করা হয়। বীরে মা'উনার মর্মান্তিক হত্যাকাণ্ডে বেঁচে যাওয়া একমাত্র ছাহাবী আমর বিন উমাইয়া যামরী পাহারাদারকে লুকিয়ে অতীব চতুরতার সাথে তার লাশ এনে সসম্মানে দাফন করেন। অন্যদিকে দলনেতা আছেম-এর লাশ আনার জন্য কুরায়েশ নেতারা লোক পাঠান। কিন্তু আল্লাহ তার লাশের হেফাযতের জন্য এক ঝাঁক ভীমরুল পাঠান। ফলে মুশরিকরা তার লাশের ধারে যেতে পারেনি। কেননা আছেম আল্লাহ্র নিকটে অঙ্গীকার দিয়েছিলেন যে, তাকে যেন কোন মুশরিক স্পর্শ না করে এবং তিনিও কোন মুশরিককে স্পর্শ না করেন। পরে হযরত ওমর বলেন, আল্লাহ তাঁর মুমিন বান্দাকে মৃত্যুর পরেও হেফাযত করেন, যেমন তাকে জীবিত অবস্থায় হেফাযত করে থাকেন'।

কুরায়েশরা খোবায়েরকে হারেছ বিন আমেরের বাড়ীতে কয়েকদিন বন্দী রাখে। এ সময় তাকে কোন খাদ্য বা পানীয় দেওয়া হয়নি। একদিন হঠাৎ হারেছ-এর ছোট বাচ্চা ছেলে ধারালো ছুরি নিয়ে খেলতে খেলতে তার কাছে আসে। তিনি তাকে আদর করে কোলে বসান। এ দৃশ্য দেখে বাচ্চার মা চিৎকার করে ওঠে। তখন খোবায়েব বলেন, মুসলমান কখনো বিশ্বাসঘাতকতা করে না। মৃত্যুর পূর্বে খোবায়েবের শেষ বাক্য ছিল- اللهم بلغنا رسالة فبلغه ما يصنع بنا– 'হে আল্লাহ, আমরা তোমার রাসূলের রিসালাত পৌঁছে দিয়েছি এবং তুমি তাকে আমাদের খবর পৌঁছে দিয়ো। ওমরের গবর্ণর সাঈদ বিন আমের (রাঃ) যিনি খোবায়েবের মৃত্যু দৃশ্যের প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন। তিনি উক্ত মর্মান্তিক ঘটনা স্মরণ করে মাঝে-মধ্যে বেহুঁশ হয়ে পড়ে যেতেন। তিনি বলতেন, খোবায়েবের হত্যাকাণ্ডের দৃশ্য স্মরণ হ'লে আমি নিজেকে ধরে রাখতে পারি না। আল্লাহ্র পথে কতবড় ধৈর্যশীল তিনি ছিলেন যে, একবার উহ্ পর্যন্ত উচ্চারণ করেননি। বন্দী অবস্থায় তাঁকে থোকা থোকা আঙ্গুর খেতে দেখা যায়। অথচ ঐসময় মক্কায় কোন ফল ছিল না।

২৫। সারিইয়া বিরে মাঊনা (سرية بئر معونة) : ৪র্থ হিজরীর ছফর মাস। পূর্বোক্ত ঘটনাটির চাইতে এটি ছিল আরও বেশী মর্মন্তুদ এবং দু'টি ঘটনা একই মাসে সংঘটিত হয়। নাজদের নেতা আবু বারা আমের বিন মালেকের আমন্ত্রণক্রমে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নাজদবাসীদের দ্বীনের দাওয়াত দেওয়ার জন্য মুনযির বিন আমের (রাঃ)-এর নেতৃত্বে ৭০ জনের একটি দল প্রেরণ করেন। যাদের সকলে ছিলেন শীর্ষস্থানীয় ক্বারী ও বিজ্ঞ আলেম। মাঊনা নামক কুয়ার নিকটে পৌঁছলে বনু সুলাইমের তিনটি গোত্র উছাইয়া, রে'ল ও যাকওয়ান (عصية، رعل و ذكوان) চতুর্দিক হ'তে তাদের উপরে অতর্কিতে আক্রমণ চালিয়ে সবাইকে হত্যা করে। একমাত্র আমর বিন উমাইয়া যামরী

২. *বুখারী হা/৩৯৮৯।*

রক্ষা পান মুযার গোত্রের সঙ্গে সম্পর্ক থাকার কারণে। এতদ্ব্যতীত কা'ব বিন যায়েদ জীবিত ছিলেন। তাঁকে নিহতদের মধ্য থেকে উঠিয়ে আনা হয়। পরে তিনি ৫ম হিজরীর শাওয়াল মাসে সংঘটিত খন্দকের যুদ্ধের সময় শহীদ হন। এই সময় রাসূলের পত্র বাহক হারাম বিন মিলহানকে প্রাপক গোত্র নেতা আমের বিন তোফায়েল-এর ইংগিতে অতর্কিতে পিছন থেকে বর্শাবিদ্ধ করে হত্যা করা হ'লে তিনি বলে ওঠেন, اللهُ أَكْبَرُ فُزْتُ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ 'আল্লাহু আকবর! কা'বার রবের কসম! আমি সফল হয়েছি'। হারাম বিন মিলহানের মৃত্যুকালীন শেষ বাক্যটি হত্যাকারী জাব্বার বিন সুলমা (جبار بن سلمى)-এর অন্তরে এমনভাবে দাগ কাটে যে, পরে তিনি মদীনায় গিয়ে রাসূলের নিকটে ইসলাম কবুল করেন।[৩]

মাত্র কয়েকদিনের ব্যবধানে পরপর দু'টি হৃদয় বিদারক ঘটনায় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) দারুনভাবে ব্যথিত হন এবং বনু লেহিয়ান, রে'ল ও যাকওয়ান এবং উছাইয়া গোত্র সমূহের বিরুদ্ধে এক মাস যাবত বদ দো'আ করে ফজরের ছালাতে কুনূতে নাযেলাহ পাঠ করেন।

২৬। সারিইয়াহ আমর ইবনে উমাইয়া যামরী (سرية عمرو بن أمية الضمري) : ৪র্থ হিজরীর রবীউল আউয়াল মাস। বি'রে মাঊনার মর্মান্তিক ঘটনায় বেঁচে যাওয়া ছাহাবী আমর ইবনে উমাইয়া যামরী বি'রে মাঊনা হ'তে মদীনায় ফেরার পথে ক্বারক্বারা নামক বিশ্রাম স্থলে পৌঁছে বনু কেলাব গোত্রের দু'ব্যক্তিকে ঘুমন্ত অবস্থায় হত্যা করেন। এর মাধ্যমে তিনি সাথীদের হত্যার প্রতিশোধ নিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু উক্ত গোত্রের সঙ্গে যে রাসূল (ছাঃ)-এর সন্ধিচুক্তি ছিল, তা তিনি জানতেন না। ফলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাদেরকে রক্তমূল্য প্রদান করেন। কিন্তু এই ঘটনা পরবর্তীতে বনু নাযীর যুদ্ধের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

২৭। গাযওয়া বনু নাযীর (غزوة بني نضير) : ৪র্থ হিজরীর রবীউল আউয়াল মাস। মদীনার মুনাফিক ও মক্কার কুরায়েশ নেতাদের চক্রান্তে বনু নাযীরের ইহুদীরা চুক্তি ভঙ্গ করে এবং রাসূল (ছাঃ) তাদের কাছে এলে তারা তাঁকে শঠতার মাধ্যমে বসিয়ে রেখে দেওয়ালের উপর থেকে পাথর ফেলে হত্যার ষড়যন্ত্র করে। তখন সেখান থেকে ফিরে এসে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাদের দুর্গ অবরোধ করেন। অতঃপর ছয় বা পনের দিন অবরোধের পরে তারা আত্মসমর্পণ করলে তাদেরকে মদীনা থেকে চিরদিনের মত বহিষ্কার করা হয় ও তারা খায়বরে গিয়ে বসতি স্থাপন করে। এ ঘটনা উপলক্ষে সূরা হাশর নাযিল হয়। ইবনু আব্বাস একে 'সূরা বনী নাযীর' বলতেন। এই যুদ্ধে ফাই-য়ের বিধান নাযিল হয়। মুনাফিকরা বনু নাযীরকে রাসূলের বিরুদ্ধে উস্কে দিয়ে সটকে পড়ায় তাদের বিরুদ্ধে সূরা হাশরের ১৬-১৭ আয়াত দু'টি নাযিল হয়।

২৮। গাযওয়া নাজদ (غزوة نجد) : ৪র্থ হিজরীর রবীউল আখের মাস। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সংবাদ পেলেন যে, বনু গাত্বফানের দু'টি গোত্র বনু মুহারিব ও বনু ছা'লাবাহ মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য বেদুঈন ও পল্লীবাসীদের মধ্য হ'তে সৈন্য সংগ্রহ করছে। এ খবর পাওয়ার সাথে সাথে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নাজদ অভিমুখে যাত্রা করেন। এই আকস্মিক অভিযানে উদ্ধত বেদুঈনরা ভয়ে পালিয়ে যায় ও তাদের মদীনা আক্রমণের স্বপ্ন ধূলিসাৎ হয়ে যায়।

২৯। গাযওয়া বদর আখের (غزوة بدر الآخر) : ৪র্থ হিজরীর শা'বান মোতাবেক ৬২৬ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে দেড় হাযার সৈন্য নিয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বদর অভিমুখে রওয়ানা হন। গত বছর ওহোদ যুদ্ধ থেকে ফিরে যাওয়ার সময় আবু সুফিয়ান আগামী বছর পুনরায় মদীনা হামলা করবেন বলে ওয়াদা করেছিলেন। তার হামলা মুকাবিলার জন্য রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আগে ভাগেই বদর প্রান্তরে উপস্থিত হন। ওদিকে শত্রুপক্ষের অবস্থা ছিল এই যে, আবু সুফিয়ান ২০০০ সৈন্যের বাহিনী নিয়ে যথাসময়ে রওয়ানা হয়ে মার্রুয যাহরান পৌঁছে 'মাজিন্নাহ' (مجنة) ঝর্ণার নিকটে শিবির স্থাপন করেন। কিন্তু তিনি যুদ্ধ করার মনোবল হারিয়ে ফেলেন এবং বিভিন্ন অজুহাত দেখিয়ে মক্কায় ফিরে যেতে চান। তাতে সৈন্যদের সকলে এক বাক্যে সায় দেয় এবং সেখান থেকেই তারা মক্কায় ফিরে যায়।

৮ দিন অপেক্ষার পর শত্রু পক্ষের দেখা না পেয়ে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) মদীনায় ফিরে আসার সিদ্ধান্ত নেন। এরি মধ্যে মুসলমানেরা সেখানে ব্যবসা করে দ্বিগুণ লাভবান হন। উল্লেখ্য যে, বদর ছিল অন্যতম বড় ব্যবসা কেন্দ্র। সংঘর্ষ না হ'লেও এই অভিযানকে বদরে আখের বা বদরের শেষ যুদ্ধ বলা হয়। আবু সফিয়ানের পশ্চাদপসারণের ঘটনায় সারা আরবে মুসলিম শক্তির প্রতি সকলের শ্রদ্ধাবোধ সৃষ্টি হয়।

৩০। গাযওয়া দূমাতুল জান্দাল (غزوة دومة الجندل) : ৫ম হিজরীর ২৫শে রবীউল আউয়াল। খবর এলো যে, সিরিয়ার নিকটবর্তী দূমাতুল জান্দাল শহরের একদল লোক সিরিয়া যাতায়াতকারী ব্যবসায়িক কাফেলা সমূহের উপরে লুটপাট চালায়। তারা মদীনায় হামলার জন্য বিরাট এক

৩. *রহমাতুল্লিল আলামীন ১/১১৪।*

বাহিনী প্রস্তুত করছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কালবিলম্ব না করে ১০০০ ফৌজ নিয়ে মদীনা হ'তে ১৫ রাত্রির পথ অতিক্রম করার উদ্দেশ্যে রওয়ানা করলেন। কিন্তু শহরে পৌঁছে কাউকে পেলেন না। শত্রুপক্ষ টের পেয়ে আগেই পালিয়ে গিয়েছিল। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সেখানে কয়েকদিন অবস্থান করেন ও চারদিকে ছোট ছোট সৈন্যদল প্রেরণ করেন। কিন্তু শত্রুদের কারু নাগাল পাওয়া যায়নি। অবশেষে কিছু গবাদিপশু নিয়ে তিনি ফিরে আসেন। কিন্তু এতে লাভ হয় এই যে, শত্রুরা আর মাথা চাড়া দেয়নি। তাতে ইসলাম প্রচারের শান্ত পরিবেশ তৈরী হয়। পথিমধ্যে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ওয়ায়না বিন হিছন-এর সাথে সন্ধিচুক্তি করেন।

৩১। গাযওয়া আহযাব (غزوة الأحزاب) বা খন্দকের যুদ্ধ : ৫ম হিজরীর শওয়াল ও যুলক্বা'দাহ মাস। বিতাড়িত বনু নাযীর ইহুদী গোত্রের নেতাদের উস্কানীতে কুরায়েশ নেতা আবু সুফিয়ানের নেতৃত্বে কেনানাহ ও তেহামার মিত্র গোত্র সমূহ মিলে ৪০০০ কুরায়েশ বাহিনী এবং বনু গাত্বফান ও নাজদীদের ৬০০০ সৈন্যের সম্মিলিত বাহিনীর ১০,০০০ সৈন্য মদীনা অবরোধ করে। যা ছিল মদীনার মোট লোকসংখ্যার চাইতে বেশী। কিন্তু সালমান ফারেসীর পরামর্শক্রমে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) মদীনার উত্তর পার্শ্বে ওহোদের দিকে দীর্ঘ খন্দক বা পরিখা খনন করে তার পিছনে ৩০০০ সৈন্য সমাবেশ করেন। এই নতুন কৌশল দেখে কাফের বাহিনী হতচকিত হয়ে যায়। পরিখা অতিক্রম করা তাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। ফলে উভয় পক্ষে তীর চালনায় ৬ জন মুসলিম ও ১০ জন কাফির মারা যায়। অতঃপর দীর্ঘ প্রায় এক মাস অবরোধে খাদ্যকষ্টে পতিত কাফের বাহিনীর উপরে হঠাৎ একরাতে উত্তপ্ত বায়ুর ঝড় নেমে আসে। তাতে তাদের তাঁবু সমূহ উড়ে যায় এবং তারা যুদ্ধক্ষেত্র হ'তে পালিয়ে যায়। সম্মিলিত বাহিনীর এই পরাজয়ের ফলে সমগ্র আরবে মদীনা রাষ্ট্রের সম্মান বৃদ্ধি পায় এবং সম্ভাব্য শত্রুরা মুখ লুকাতে বাধ্য হয়। কেননা আহযাব যুদ্ধের ন্যায় বিশাল বাহিনীর সমাবেশ ঘটানো পুনরায় আরবদের জন্য সম্ভবপর ছিল না।

৩২। গাযওয়া বনু কুরায়যা (غزوة بني قريظة) : ৫ম হিজরীর যুলক্বা'দাহ ও যিলহাজ্জ মাস। মদীনার সর্বশেষ এই ইহুদী গোত্রটি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে কৃত চুক্তি ভঙ্গ করে আহযাব যুদ্ধে আক্রমণকারী বাহিনীর সাথে চুক্তিবদ্ধ হয় ও তাদেরকে নানাভাবে সাহায্য করে। বিতাড়িত বনু নাযীর গোত্রের নেতা হুয়াই বিন আখত্বাবের প্ররোচনায় তারা চুক্তি ভঙ্গ করেছিল। আহযাব যুদ্ধ থেকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মদীনায় ফিরে আসেন যুলক্বা'দাহ মাসের শেষ সপ্তাহের বুধবারে। এসে যোহরের সময় যখন তিনি উম্মে সালামার গৃহে গোসল করছিলেন, তখন জিব্রীলের আগমন ঘটে এবং তাকে তখনই বনু কুরায়যার উপরে হামলা পরিচালনার আহ্বান জানিয়ে বলেন, আপনি দ্রুত আসুন! আমি আগে গিয়ে দুর্গে কম্পন সৃষ্টি করে ওদের অন্তরে ভীতির সঞ্চার করে দিই'। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সাথে সাথে সবাইকে নির্দেশ দিয়ে বলেন, যেন সবাই বনু কুরায়যায় গিয়ে আছর পড়ে। এই সময় রাসূলের সাথে ৩০০০ সৈন্য ছিলেন। ২৫ দিন অবরোধের পর তারা আত্মসমর্পণ করে এবং তাদের মিত্র সা'দ বিন মু'আযের সিদ্ধান্ত মতে তাদের বয়স্ক পুরুষ বন্দী ছয় থেকে সাত শতের মত লোককে হত্যা করা হয়। বাকীদের বহিষ্কার করা হয়। এই অবরোধকালে মুসলিম পক্ষে একজন শহীদ ও একজন স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করেন। ঘটনার কয়েকদিনের মধ্যে হযরত সা'দ বিন মু'আয (রাঃ) মৃত্যু বরণ করেন। যিনি ইতিপূর্বে খন্দকের যুদ্ধে আহত হয়েছিলেন।

৩৩। সারিইয়া আব্দুল্লাহ বিন আতীক আনছারী : ৫ম হিজরীর যিলহাজ্জ মাস। বনু কুরায়যার শত্রুতা থেকে মুক্ত হয়ে কিছুটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলার পর খায়বারের আবু রাফে' দুর্গের অধিপতি অন্যতম শীর্ষ দুষ্টমতি ইহুদী নেতা এবং মদীনা থেকে বিতাড়িত বনু নাযীর গোত্রের অন্যতম সর্দার সালাম বিন আবুল হুক্বাইক্বকে হত্যার জন্য খাযরাজ গোত্রের বনু সালামা শাখার লোকেরা রাসূলের নিকটে দাবী করে। সালামের উপনাম ছিল আবু রাফে'। সে ছিল কা'ব বিন আশরাফের ন্যায় প্রচণ্ড ইসলাম ও রাসূল বিদ্বেষী ইহুদী নেতা। মুসলিম বাহিনীর বিরুদ্ধে সর্বদা সে শত্রুপক্ষকে সাহায্য করত। ওহোদ যুদ্ধের দিন আব্দুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের প্ররোচনায় বনু সালামা গোত্রের লোকেরা ফিরে যেতে উদ্যত হয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তারা যায়নি। এ সম্পর্কে সূরা আলে ইমরান ১২২ আয়াত নাযিল হয়। খন্দকের যুদ্ধের দিনও এরা মুনাফিকদের প্ররোচনায় যুদ্ধের ময়দান থেকে ফিরে যেতে চেয়েছিল এবং রাসূলের নিকটে ওযর পেশ করেছিল *(আহযাব ১২-১৩)*। সেই বদনামী দূর করার জন্য এবং ইতিপূর্বে ৩য় হিজরীর রবীউল আউয়াল মাসে আউস গোত্রের লোকেরা মুহাম্মাদ বিন মাসলামার নেতৃত্বে রাসূলের নির্দেশে কা'ব বিন আশরাফকে হত্যা করে প্রশংসা কুড়িয়েছিল, অনুরূপভাবে একটি দুঃসাহসিক কাজ করার জন্য তারা রাসূলের অনুমতি প্রার্থনা করে। অতঃপর রাসূলের অনুমতি নিয়ে আব্দুল্লাহ বিন আতীকের নেতৃত্বে তাদের পাঁচ সদস্যের একটি দল খায়বর অভিমুখে রওয়ানা হয় এবং কৌশলে দুর্গের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে আবু রাফে' সালাম বিন আবিল হুক্বাইক্বকে হত্যা করে ফিরে আসে।

৩৪। সারিইয়া মুহাম্মাদ বিন মাসলামাহ (سرية محمد بن مسلمة) **:** ৬ষ্ঠ হিজরীর মুহাররম মাস। মদীনার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারী নাজদের বনু বাকর বিন কিলাব গোত্রের প্রতি মুহাম্মাদ বিন মাসলামাহ আনছারীর নেতৃত্বে ৩০ জনের এই দলকে ১০ই মুহাররম তারিখে মদীনা থেকে প্রেরণ করা হয়। মুসলিম বাহিনী সেখানে পৌঁছানোর সাথে সাথে তারা পালিয়ে যায়। তাদের পরিত্যক্ত ধন-সম্পদ নিয়ে ফিরে আসার পথে ইয়ামামার হানীফা গোত্রের সরদার ছুমামাহ বিন আছাল হানাফী (ثمامة بن أثال) তাদের হাতে গ্রেফতার হয়। উক্ত ব্যক্তি ইয়ামামার নেতা মুসায়লামার নির্দেশ মতে ছদ্মবেশে মদীনায় যাচ্ছিল রাসূলকে গোপনে হত্যা করার জন্য। উল্লেখ্য যে, মুসায়লামা ১০ম হিজরী সনে নিজেই মিথ্যা নবুঅত দাবী করে এবং হযরত আবুবকরের খেলাফত কালে দ্বাদশ হিজরী রবীউল আউয়াল মাসে ইয়ামামার যুদ্ধে ওয়াহশীর হাতে নিহত হয়। ছুমামাকে এনে মসজিদে নববীর খুঁটিতে বেঁধে রাখা হয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে জিজ্ঞেস করেন ما عندك يا ثمامة 'তোমার নিকটে কি আছে হে ছুমামাহ! সে বলল, عندي خير يا محمد 'আমার কাছে মঙ্গল আছে হে মুহাম্মাদ'! এভাবে তিনদিন একই প্রশ্নের একই জবাব দিলে রাসূল (ছাঃ) তাকে মুক্তির নির্দেশ দেন। মুক্তি পেয়ে সে গোসল করে এসে বায়'আত করে ইসলাম কবুল করে। অতঃপর সে মক্কায় গিয়ে ওমরাহ করে। সেখানে কুরায়েশ নেতারা তাকে বলে, صبأت يا ثمامة হে ছুমামা! তুমি কি বেদ্বীন হয়ে গেছ? জবাবে তিনি বলেন, لا والله ولكني أسلمت مع محمد صـ। অতঃপর তিনি কুরায়েশ নেতাদের হুমকি দেন যে, ইয়ামামা থেকে তোমাদের জন্য গমের একটি দানাও আর আসবে না, যে পর্যন্ত না রাসূল নির্দেশ দেন'। ঐ সময় ইয়ামামা ছিল মক্কাবাসীদের জন্য শস্যভাণ্ডার স্বরূপ। হুমকি মতে শস্য আগমন বন্ধ হয়ে গেলে মক্কাবাসীগণ বাধ্য হয়ে রাসূলের নিকটে আত্মীয়তার দোহাই দিয়ে পত্র লেখে। তখন রাসূলের নির্দেশে পুনরায় শস্য রফতানী শুরু হয়।

মুহাররম মাসের একদিন বাকী থাকতে এই অভিযাত্রী দল মদীনায় ফিরে আসে। যা পরবর্তী সময়ের জন্য খুবই ফলদায়ক প্রমাণিত হয়।

৩৫। গাযওয়া বনু লাহিয়ান (غزوة بني لَحْيان) **:** ৬ষ্ঠ হিজরীর রবীউল আউয়াল অথবা জুমাদাল উলা মাস। ৪র্থ হিজরীর ছফর মাসে এই গোত্রের লোকেরা প্রতারণার মাধ্যমে ডেকে নিয়ে মক্কা সীমান্তে রাজী' নামক স্থানে ১০ জন নিরীহ ছাহাবীকে হত্যা করে। যাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন হযরত খোবায়েব (রাঃ)। তাদের হত্যার প্রতিশোধ নেবার জন্য রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) স্বয়ং ২০০ সৈন্য নিয়ে এই অভিযানে বের হন। রাজী' পৌঁছে 'গারান' (بطن غران) উপত্যকার যে স্থলে ৮ জন ছাহাবীকে হত্যা করা হয়েছিল, সেখানে উপস্থিত হয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাদের উপর করুণাসিক্ত হয়ে পড়েন ও তাদের জন্য দো'আ করেন (ترحم عليهم ودعا لهم)। বনু লাহিয়ান গোত্রের লোকেরা পালিয়ে যায়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সেখানে দু'দিন অবস্থান করেন। পরে তিনি আসফান ও মক্কার দিকে ছোট ছোট দল প্রেরণ করেন। কিন্তু কারু নাগাল না পেয়ে ১৪ দিন পরে মদীনায় ফিরে আসেন। এরপর থেকে তিনি বেদুঈন হামলা বন্ধের জন্য বিভিন্ন এলাকায় ছোট ছোট অভিযান সমূহ প্রেরণ করতে থাকেন।

৩৬। সারিইয়াহ উক্কাশা বিন মিহছান (سرية عكاشة بن محصن) **:** ৬ষ্ঠ হিজরীর রবীউল আউয়াল অথবা আখের। ৪০ জনের একটি সেনাদল নিয়ে বনু আসাদ গোত্রের গামার (ماء غمر) প্রস্রবণের দিকে উক্কাশার নেতৃত্বে প্রেরিত হয়। কেননা বনু আসাদ গোত্র মদীনায় হামলা করার জন্য সৈন্য সংগ্রহ করছিল। মুসলিম বাহিনীর আকস্মিক উপস্থিতিতে তারা পালিয়ে যায়। পরে গণীমত হিসাবে ২০০ উট নিয়ে বাহিনী মদীনায় ফিরে আসে।

৩৭। সারিইয়াহ মুহাম্মাদ বিন মাসলামাহ (سرية محمد بن مسلمة) **:** ৬ষ্ঠ হিজরীর রবীউল আউয়াল অথবা আখের। ১০ সদস্যের একটি বিদ্বান দল মুহাম্মাদ বিন মাসলামাহ্র নেতৃত্বে বনু ছা'লাবাহ অঞ্চলের যুল-ক্বিছছা (ذو القصة) নামক স্থানে প্রেরিত হয়। মানছূরপুরী বলেন, এঁরা সেখানে দ্বীনের দাওয়াত ও তা'লীমের জন্য গিয়েছিলেন। রাতে ঘুমন্ত অবস্থায় শত্রুদের প্রায় একশত লোক এসে তাদেরকে হত্যা করে। দলনেতা মুহাম্মাদ বিন মাসলামাহ আহত অবস্থায় ফিরে আসতে সক্ষম হন।

৩৮। সারিইয়া আবু উবায়দাহ ইবনুল জাররাহ (سرية أبي عبيدة بن الجراح) **:** ৬ষ্ঠ হিজরীর রবীউল আখের। পূর্বের হত্যাকাণ্ডের প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য ৪০ জনের এই দল যুল-ক্বিছছায় প্রেরিত হয়। কিন্তু বনু ছা'লাবাহ গোত্রের সবাই পালিয়ে যায়। একজন গ্রেফতার হ'লে সে মুসলমান

হয়ে যায়। ফলে তাদের পরিত্যক্ত গবাদি-পশু নিয়ে তারা ফিরে আসেন।

৩৯। সারিইয়া যায়েদ বিন হারেছাহ (سرية زيد بن حارثة) : ৬ষ্ঠ হিজরীর রবীউল আখের মাস। যায়েদ বিন হারেছাহ্র নেতৃত্বে একটি সেনাদল মাররুয যাহরানের বনু সুলায়েম গোত্রের 'জুমূম' (ماء جموم) ঝর্ণার দিকে প্রেরিত হয়। বনু সুলায়েমের কয়েকজন লোক বন্দী হয়। হালীমা নাম্নী একজন বন্দী মহিলা সহ বাকী বন্দী ও গবাদিপশু নিয়ে যায়েদ মদীনা ফিরে আসেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বন্দীদের ছেড়ে দেন ও মহিলাকে মুক্ত করে বিবাহের ব্যবস্থা করে দেন।

৪০। সারিইয়া যায়েদ ইবনু হারেছাহ (سرية زيد بن حارثة) : ৬ষ্ঠ হিজরীর জুমাদাল ঊলা। ১৭০ জনের একটি দল নিয়ে তিনি শামের নিকটবর্তী ঈছ (العيص) অভিমুখে প্রেরিত হন। ঐপথে তখন রাসূলের জামাতা আবুল 'আছ বিন রবী' বিন আবদে শামস বিন আবদে মানাফ বিন কুছাই-এর নেতৃত্বে একটি কুরায়েশ বাণিজ্য কাফেলা মক্কা অভিমুখে অতিক্রম করছিল। আবুল 'আছ দ্রুত মদীনায় এসে নবী তনয়া যয়নবের আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং রাসূলকে কাফেলার সব মালামাল ফেরত দানের অনুরোধ করেন। সেমতে তাকে সব মাল ফেরৎ দেওয়া হয়। আবুল 'আছ মক্কায় গিয়ে পাওনাদারদের মালামাল বুঝিয়ে দেন ও প্রকাশ্যে ইসলাম কবুলের ঘোষণা দেন। অতঃপর তিনি মদীনায় ফিরে এলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) প্রায় তিন বছরের কিছু পরে যয়নবকে পূর্বের বিবাহের উপরে তার স্বামীর নিকটে অর্পণ করেন। উল্লেখ্য যে, আবুল 'আছ ছিলেন যয়নবের আপন খালাতো ভাই এবং খাদীজার জীবদ্দশায় তাদের বিবাহ হয়।

৪১। সারিইয়া যায়েদ ইবনু হারেছাহ (سرية زيد بن حارثة) : ৬ষ্ঠ হিজরীর জুমাদাল আখেরাহ। ১৫ সদস্যের একটি বাহিনীসহ তিনি বনু ছা'লাবা গোত্রের তরফ (الطرف) অথবা তুরুক্ব (طرق) নামক স্থানে প্রেরিত হন। কিন্তু শত্রুপক্ষ পালিয়ে যায়। ৪ দিন অবস্থান শেষে যায়েদ মদীনায় ফিরে আসেন।

৪২। সারিইয়া যায়েদ বিন হারেছাহ (سرية زيد بن حارثة) : ৬ষ্ঠ হিজরীর রজব মাস। ১২ জনের একটি দল ওয়াদিল ক্বোরা (وادي القرى) এলাকায় প্রেরিত হন শত্রুপক্ষের গতিবিধি লক্ষ্য করার জন্য। কিন্তু এলাকাবাসী তাদের উপরে অতর্কিতে হামলা করে ৯ জনকে হত্যা করে। যায়েদ সহ তিনজন রক্ষা পান।

৪৩। গাযওয়া বনুল মুছত্বালিক্ব বা মুরাইসী (غزوة بني المصطلق أو المريسيع) : ৬ষ্ঠ হিজরীর ৩রা শা'বান। মুরাইসী' নামক ঝর্ণাধারার নিকট উপনীত হওয়ার পর উভয় পক্ষে যুদ্ধ শুরু হয়। মুসলমানগণ সহজ বিজয় অর্জন করেন। কাফের পক্ষের ১০ জন নিহত ও ১৯ জন আহত হয়। মুসলিম পক্ষে একজন নিহত হন। জনৈক আনছার তাকে শত্রু ভেবে ভুলক্রমে হত্যা করেন। গোত্রনেতা হারেছ কন্যা জুওয়াইরিয়া (جويرية)-এর সঙ্গে রাসূলের বিবাহ হয়। ফলে শ্বশুর গোত্রের লোক হওয়ায় বিজিত দলের একশত পরিবারকে মুক্তি দিলে তারা সবাই ইসলাম কবুল করে। এই যুদ্ধে ওহোদ যুদ্ধের পর সর্বপ্রথম মুনাফিকদের একটি দলকে রাসূলের সাথে যুদ্ধে যাবার অনুমতি দেওয়া হয়। এই যুদ্ধ হ'তে ফেরার সময় ইফকের ঘটনা ঘটে। এই সময় সূরা মুনাফিকূন নাযিল হয় এবং পরে হযরত আয়েশার পবিত্রতা বর্ণনায় সূরা নূর ১১-২০ পর্যন্ত ১০টি আয়াত নাযিল হয়।

৪৪। সারিইয়া আব্দুর রহমান ইবনে 'আওফ (سرية عبد الرحمن بن عوف القرشي) : ৬ষ্ঠ হিজরীর শা'বান মাসে। দূমাতুল জান্দাল এলাকায় বনু কলব খৃষ্টান গোত্রের বিরুদ্ধে প্রেরিত হয় এবং সহজ বিজয় অর্জিত হয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিজ হাতে তার মাথায় পাগড়ী বেঁধে দেন ও যুদ্ধে সর্বোত্তম পন্থা গ্রহণের উপদেশ দেন। তিনি এখানে তিনদিন অবস্থান করে সবাইকে ইসলামের দাওয়াত দেন। ফলে খৃষ্টান গোত্রনেতাসহ সকলে মুসলমান হয়ে যায়।

৪৫। সারিইয়া আলী ইবনে আবু ত্বালিব (سرية علي بن أبي طالب) : ৬ষ্ঠ হিজরীর শা'বান মাসে। ২০০ জনের একটি সেনাদল নিয়ে হযরত আলী (রাঃ) খায়বরের ফিদাক অঞ্চলে বনু সা'দ বিন বকর গোত্রের বিরুদ্ধে প্রেরিত হন, যারা ইহুদীদের সাহায্যার্থে প্রস্তুতি নিচ্ছিল। বনু সা'দ পালিয়ে যায়। তাদের ফেলে যাওয়া ৫০০ উট ও ২০০০ ছাগল মুসলিম বাহিনীর হস্তগত হয়।

৪৬। সারিইয়া আবুবকর ছিদ্দীক (سرية أبي بكر الصديق) : ৬ষ্ঠ হিজরীর রামাযান মাসে। ওয়াদিল ক্বোরা এলাকার বনু ফাযারাহ গোত্রের একটি শাখার নেত্রী উম্মে কুরফা (أم قرفة) ৩০ জন সশস্ত্র ব্যক্তিকে প্রস্তুত করেছে রাসূলকে অপহরণ ও হত্যা করার জন্য। এই ষড়যন্ত্রের কথা অবগত হয়ে হযরত আবু বকর অথবা হযরত যায়েদ বিন হারেছাহ

(রাঃ)-এর নেতৃত্বে সেখানে একটি বাহিনী প্রেরিত হয়। উক্ত ৩০ জনের সবাইকে হত্যা করা হয় এবং দলনেত্রীর কন্যা অন্যতম সেরা আরব সুন্দরী মেয়েকে (من أحسن العرب) দাসী হিসাবে মক্কায় পাঠিয়ে তার বিনিময়ে সেখান থেকে কয়েকজন মুসলিম বন্দীকে মুক্ত করা হয়।[৪]

৪৭। সারিইয়া কুরয বিন জাবের আল-ফিহরী (سرية كرز بن جابر الفهري) : ৬ষ্ঠ হিজরীর শাওয়াল মাসে উরাইনা গোত্রের প্রতি তিনি ২০ জন অশ্বারোহী সহ প্রেরিত হন। দলনেতা কুরয ছিলেন কুরায়েশ নেতা, যিনি ২য় হিজরীর রবীউল আওয়াল মাসে সর্বপ্রথম মদীনার উপকণ্ঠে হামলা চালিয়ে বহু গবাদিপশু লুট করে নিয়ে যান এবং রাসূল (ছাঃ) স্বয়ং যার পশ্চাদ্ধাবন করে বদরের উপকণ্ঠে সাফওয়ান পর্যন্ত পৌঁছে যান (দ্রঃ গাযওয়া সাফওয়ান ক্রমিক সংখ্যা-৬)। পরে তিনি ইসলাম কবুল করেন এবং মক্কা বিজয়ের দিন শহীদ হন। অত্র অভিযানের কারণ ছিল এই যে, ওক্ল ও উরাইনা (عكل وعرينة) গোত্রের কিছু লোক ইসলাম কবুল করে মদীনায় বসবাস করতে থাকে। কিন্তু তারা অসুস্থ হয়ে পড়ে। তখন তাদেরকে কিছু দূরে উটের চারণ ক্ষেত্রে পাঠিয়ে দেওয়া হয় এবং সেখানে তাদেরকে উটের দুধ ও পেশাব পান করতে বলা হয়। এতে তারা দ্রুত সুস্থতা লাভ করে। কিন্তু একদিন তারা রাসূলের রাখালকে হত্যা করে উটগুলো সব নিজেদের এলাকায় খেদিয়ে নিয়ে যায় এবং পুনরায় কাফির হয়ে যায়। ফলে তাদের বিরুদ্ধে এই অভিযান প্রেরিত হয়।

অভিযান প্রেরণের সময় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) দো'আ করেছিলেন যে, اللهم اعم عليهم الطريق واجعلها عليهم اضيق من مسك 'আল্লাহ তুমি ওদের রাস্তা অন্ধকার করে দাও এবং তা তাদের উপরে .... চাইতে সংকীর্ণতর করে দাও'। প্রেরিত সেনাদল তাদের গ্রেফতার করেন এবং হাত-পা কেটে ও চোখ অন্ধ করে 'হাররাহ' (حرّة) নামক স্থানে ছেড়ে দেন। সেখানেই তারা মরে পড়ে থাকে।[৫] মানছূরপুরী এদের সংখ্যা ৮ জন বলেছেন।

৪৮। সারিইয়াহ আমর ইবনে উমাইয়া যামরী (سرية عمرو بن أمية الضمري) : ৬ষ্ঠ হিজরীর শাওয়াল মাসে। সালামাহ বিন আবু সালামাহ সহ দুইজনের এই ক্ষুদ্র দলটি প্রেরিত হয় আবু সুফিয়ানকে হত্যা করার জন্য। কেননা তিনি ইতিপূর্বে একজন বেদুঈনকে মদীনায় পাঠিয়েছিলেন রাসূলকে হত্যা করার জন্য। কিন্তু কারু কোন অভিযানই সফল হয়নি।

৪৯। সারিইয়া আবু ওবায়দাহ ইবনুল জাররাহ (سرية أبي عبيدة بن الجراح) : ৬ষ্ঠ হিজরীতে যুলক্বা'দাহ মাসে হুদায়বিয়া সন্ধির পূর্বে। আবু ওবায়দাহ (রাঃ)-এর নেতৃত্বে ৩০০ অশ্বারোহীর এ দলটি প্রেরিত হয় একটি কুরায়েশ বাণিজ্য কাফেলা আটকানোর জন্য। অভিযানে কোন ফল হয়নি। কিন্তু সেনাদল দারুণ অনুকষ্টে পতিত হন। ফলে তাদের গাছের ছাল-পাতা খেয়ে জীবন ধারণ করতে হয়। সেকারণ এই অভিযান جيش الخبط বা 'ছাল-পাতার অভিযান' নামে অভিহিত হয়। এই সময় সমুদ্র হ'তে একটি বিশালাকারের মাছ কিনারে নিক্ষিপ্ত হয়। যাকে আম্বর (العنبر) বলা হয়। বাংলাতে যা 'তিমি মাছ' বলে পরিচিত। এই মাছ তারা ১৫দিন যাবৎ ভক্ষণ করেন। এই মাছ এত বড় ছিল যে, সেনাপতির হুকুমে তার একটি কাঁটার ঘেরের মধ্য দিয়ে দলের মধ্যকার সবচেয়ে দীর্ঘকায় ব্যক্তিটি সবচেয়ে উঁচু উটটির পিঠে আরোহন করে অনায়াসে চলে যায়। বিশেষভাবে সংরক্ষণ করে উক্ত মাছের কিছু অংশ মদীনায় আনা হয় এবং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে 'হাদিয়া' প্রদান করা হয়। তিনি বলেন, هو رزق أخرجه الله لكم 'এটি রূযী, যা আল্লাহ তোমাদের জন্য নির্গত করেছিলেন'।[৬]

৫০। গাযওয়া হুদায়বিয়া (غزوة حديبية) : ৬ষ্ঠ হিজরীর যুলক্বা'দাহ মাস। ১৪০০ (মতান্তরে ১৫০০) সাথী নিয়ে ওমরাহর উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ১লা যুলক্বা'দাহ সোমবার স্ত্রী উম্মে সালামাহ সহ মদীনা হ'তে মক্কা অভিমুখে রওয়ানা হন। এই সময় কোষবদ্ধ তরবারি ব্যতীত তাদের সাথে অন্য কোন অস্ত্র ছিল না। কিন্তু মক্কার অদূরবর্তী হুদায়বিয়া নামক স্থানে পৌঁছলে কুরায়েশ নেতাদের বাধার সম্মুখীন হন। অবশেষে তাদের সঙ্গে দশ বছরের জন্য এক শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ফলে চুক্তির শর্তানুযায়ী তিনি মদীনায় ফিরে আসেন এবং পরের বছর ওমরা করেন। এই সময় 'আসফান' (عسفان) নামক স্থানে সর্বপ্রথম ছালাতুল খাওফের হুকুম নাযিল হয় *(নিসা ১০১-১০২)*। কেননা খালেদ বিন ওয়ালীদ আছরের ছালাতের সময় ছালাতরত অবস্থায় মুসলমানদের উপরে হামলা করার পরিকল্পনা করেছিলেন। উল্লেখ্য, খালিদ তখনও মুসলমান

৪. মুসলিম ২/৮৯।
৫. মুসলিম, আনাস হ'তে ২/৮৯ পৃঃ।

৬. বুখারী ২/৬২৫ ও মুসলিম ২/১৪৫। মুবারকপুরী বলেন যে, চরিতকারগণ এটিকে ৮ম হিজরীর রজব মাসের ঘটনা বলে থাকেন। কিন্তু পূর্বাপর সম্পর্ক (السياق) বিবেচনায় দেখা যায় যে, এটি হুদায়বিয়ার পূর্বের ঘটনা। কেননা ৬ষ্ঠ হিজরীর যুল ক্বা'দাহ মাসে হোদায়বিয়ার সন্ধি হওয়ার পরে কুরায়েশ কাফেলাকে হামলা করার জন্য আর কোন মুসলিম বাহিনী প্রেরিত হয়নি'।

হননি। খালেদ ও আমর ইবনুল আছ ৭ম হিজরীর প্রথম দিকে মদীনায় গিয়ে ইসলাম কবুল করেন।

৫১। গাযওয়া যী ক্বারদ (غزوة ذي قرد أو الغابة) : ৭ম হিজরীর মুহাররম মাস। হোদায়বিয়ার সন্ধির পরে এটাই ছিল রাসূলের প্রথম যুদ্ধ, যা খায়বর যুদ্ধে গমনের মাত্র তিনদিন পূর্বে সংঘটিত হয়। বনু গাত্বফানের ফাযারা গোত্রের আব্দুর রহমান ফাযারীর নেতৃত্বে একটি ডাকাত দল মদীনায় এসে রাসূলের রাখালকে হত্যা করে চারণ ভূমি থেকে রাসূলের উট সমূহ লুট করে নিয়ে যায়। দক্ষ তীরন্দায সালামা বিন আকওয়া একাই পদব্রজে তাদের পশ্চাদ্ধাবন করে যী ক্বারদ প্রস্রবণ পর্যন্ত দীর্ঘ পথ তাড়িয়ে নিয়ে যান। তারা সমস্ত উট ছাড়াও তাদের নিজস্ব অস্ত্রশস্ত্র ও আসবাবপত্র ফেলে পালিয়ে যায়। পিছে পিছে রাসূল (ছাঃ) ৫০০ ছাহাবীর এক বাহিনী নিয়ে সন্ধ্যার পরে উপস্থিত হন। ডাকাত দলের নেতা আব্দুর রহমানের নিক্ষিপ্ত বর্শার আঘাতে ছাহাবী আখরাম শহীদ হন। পরে আবু ক্বাতাদার বর্শার আঘাতে আব্দুর রহমান নিহত হয়। সালামা বিন আকওয়া-এর দুঃসাহস ও বীরত্বের পুরস্কার স্বরূপ আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) তাকে গনীমতের দুই অংশ দান করেন এবং মদীনায় ফেরার সময় সম্মান স্বরূপ নিজের উটের পিঠে তাকে বসিয়ে নেন।

৫২। গাযওয়া খায়বর (غـــزوة خيـــبر) : ৭ম হিজরীর মুহাররম মাস। কুরায়েশদের সঙ্গে সন্ধিচুক্তির পর সকল ষড়যন্ত্রের মূল ঘাঁটি খায়বরের ইহুদীদের প্রতি এই অভিযান পরিচালিত হয়। হুদায়বিয়ার সন্ধি ও বায়'আতে রিযওয়ানে উপস্থিত ১৪০০ ছাহাবীকে নিয়ে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) স্বয়ং এই অভিযান পরিচালনা করেন। অন্যদের নেননি। এতে মুসলিম পক্ষে ১৮ জন শহীদ ও ৫০ জন আহত হন। ইহুদী পক্ষে ৯৩ জন নিহত হয়। ইহুদীদের বিতাড়িত করার সিদ্ধান্ত হয়। তবে তাদের আবেদন মতে উৎপন্ন ফসলের অর্ধেক ভাগ দেবার শর্তে তাদেরকে সেখানে বসবাস করার সাময়িক অনুমতি দেওয়া হয়। যুদ্ধে বিপুল পরিমাণ গনীমত লাভ হয়। যাতে মুসলমানদের অভাব দূর হয়ে যায়। এই সময়ে ফিদাকের ইহুদীদের নিকটে ইসলামের দাওয়াত দিয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মুহাইছাহ বিন মাসঊদকে প্রেরণ করেন। খায়বর বিজয়ের পরে তারা নিজেরা রাসূলের নিকটে দূত পাঠিয়ে আত্মসমর্পণ করে এবং খায়বরবাসীদের ন্যায় অর্ধেক ফসলে সন্ধিচুক্তি করে। বিনাযুদ্ধে ও স্রেফ রাসূলের দাওয়াতে বিজিত হওয়ায় ফিদাক ভূমি কেবল রাসূলের জন্য নির্দিষ্ট করা হয়।

৫৩। গাযওয়া ওয়াদিল ক্বোরা (غزوة وادي القرى) : ৭ম হিজরীর মুহাররম মাস। খায়বার যুদ্ধের পরে রাসূল (ছাঃ) এখানকার ইহুদীদের প্রতি গমন করেন। দিনভর যুদ্ধে মুসলিম পক্ষে রাসূলের একজন দাস এবং ইহুদী পক্ষে ১১ জন নিহত হয়। বিপুল গনীমত হস্তগত হয়। ইহুদীরা সন্ধি করে এবং চাষের জমিগুলি তাদের হাতে ছেড়ে দেওয়া হয় উৎপন্ন ফসলের অর্ধাংশ দেওয়ার শর্তে, যেভাবে খায়বারে করা হয়েছিল। ফেদাক ও তাইমার ইহুদীরা বিনাযুদ্ধে আত্মসমর্পণ করে ও সন্ধিচুক্তি সম্পাদন করে।

৫৪। সারিইয়া আবান বিন সাঈদ (سرية أبان بن سعيد) : ৭ম হিজরীর ছফর মাসে মদীনার আশপাশের লুটেরা বেদুঈনদের ভীতি প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে আবান বিন সাঈদের নেতৃত্বে নাজদের দিকে প্রেরিত হয় এবং যথাসময়ে তারা অভিযান সফল করে ফিরে আসে।[৭]

৫৫। গাযওয়া যাতুর রিক্বা' (غزوة ذات الرقـــاع) : ৭ম হিজরীর রবীউল আউয়াল মাস। খন্দকের যুদ্ধে শত্রুদের তিনটি প্রধান পক্ষের দু'টি অর্থাৎ কুরায়েশ ও ইহুদী পক্ষকে দমন করার পর তৃতীয় শক্তি নাজদের বনু গাত্বফানের দিকে এই অভিযান প্রেরিত হয়, যারা প্রায়ই মদীনার উপকণ্ঠে ডাকাতি ও লুটতরাজ করত। এদের কোন স্থায়ী জনপদ বা দুর্গ ছিল না। এরা ছিল সুযোগসন্ধানী ডাকাত দল। তাই মক্কা ও খায়বরবাসীদের ন্যায় এদের দমন করা সহজ ছিল না। ফলে এদের বিক্ষিপ্ত সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড সমূহ প্রতিহত করার জন্য অনুরূপ আকস্মিক হামলা সমূহ পরিচালনা করার প্রয়োজন ছিল। সেমতে খায়বর বিজয় সম্পন্ন করার পর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ৪০০ অথবা ৭০০ সাথী নিয়ে এদের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। আনমার অথবা বনু গাত্বফানের ছা'লাবা ও মুহারিব গোত্রের লোকেরা একত্রিত হয়ে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছে মর্মে সংবাদ পেয়ে তিনি অগ্রসর হন এবং নাখল (نخل) নামক স্থানে তাদের মুখোমুখি হন। কিন্তু তারা ছত্রভঙ্গ হয়ে পালিয়ে যায়। আবু মূসা আশ'আরী বলেন, আমাদের ৬ জনের জন্য মাত্র একটি উট ছিল, যা আমরা পালাক্রমে সওয়ার হচ্ছিলাম। এ কারণে আমাদের পা সমূহ আহত হয় ও আমার নখ ঝরে পড়ে। ফলে আমরা ছেঁড়া কাপড় দিয়ে পায়ে পট্টি বাঁধি। এ কারণ এ যুদ্ধের নাম হয় যাতুর রিক্বা' বা ছেঁড়া পট্টির যুদ্ধ।[৮]

সরাসরি যুদ্ধ না হ'লেও এই অভিযানে অনেকগুলি ঘটনা ঘটে। যেমন, (১) তরবারি গাছে ঝুলিয়ে রেখে ঘুমিয়ে পড়ার সুযোগে জনৈক মুশরিক বেদুঈন গাওরাছ ইবনুল হারেছ অথবা দা'ছূর এসে রাসূলের তরবারি নিয়ে নেয় ও তাকে হত্যা করার হুমকি দেয়। কিন্তু রাসূল (ছাঃ) যখন বলেন যে, আমাকে রক্ষা করবেন 'আল্লাহ' তখন তার হাত থেকে তরবারি পড়ে যায় এবং পরে সে মুসলমান হয়ে যায়। (২) রাসূল (ছাঃ) সবাইকে নিয়ে 'ছালাতুল খাওফ' আদায় করেন (৩) যুদ্ধ হ'তে ফেরার পথে বন্দীনী এক মুশরিক মহিলার স্বামী বদলা হিসাবে মুসলিম বাহিনীর

৭. *বুখারী, মানছূরপুরী এটা ধরেননি।*
৮. *বুখারী ২/৫৯২; মুসলিম ২/১১৮।*

রাতের বেলায় বিশ্রামের সুযোগে পাহারায় নিযুক্ত ছাহাবী আব্বাদ বিন বিশরের উপরে ছালাতরত অবস্থায় তিন তিনটি তীর নিক্ষেপ করে তাঁকে মারাত্মক আহত করা সত্ত্বেও তিনি ছালাত ভঙ্গ করেননি। পরে অন্য পাহারা আম্মার বিন ইয়াসার যখন বলেন, আমাকে কেন জাগাননি? তখন তিনি বলেন, إِنِّيْ كُنْتُ فِيْ سُوْرَةٍ فَكَرِهْتُ أَنْ أَقْطَعَهَا 'আমি একটি সূরা পাঠ করছিলাম। যা থেকে বিরত হওয়াটা আমি অপসন্দ করেছিলাম'।

এই অভিযানের ফলে বনু গাত্বফানের লোকেরা আর মাথা উঁচু করেনি। তারা ক্রমে ক্রমে সবাই ইসলাম কবুল করে। তাদের অনেকে মক্কা বিজয়ের অভিযানে ও তার পরে হুনায়েন যুদ্ধে মুসলিম বাহিনীর সাথে ছিল এবং হুনায়েনের গনীমতের অংশ লাভ করেছিল।

৫৬। সারিইয়া গালিব বিন আব্দুল্লাহ লায়ছী (سرية غالب بن عبد الله الليثي) : ৭ম হিজরীর ছফর অথবা রবীউল আউয়াল মাস। ক্বাদীদ (قديد) অঞ্চলের বনু মলূহ (بنو ملوح) গোত্রের বিরুদ্ধে প্রতিশোধমূলক এই অভিযান প্রেরিত হয়েছিল। কেননা তারা ইতিপূর্বে বাশীর বিন সুওয়াইদের (بشير بن سويد) সাথীদের হত্যা করেছিল। রাতেই হামলা করে তাদের কিছু লোককে হত্যা করা হয় ও গবাদি-পশু নিয়ে সেনাদল ফিরে আসে। প্রতিপক্ষ বিরাট দল নিয়ে পশ্চাদ্ধাবন করলেও হঠাৎ মুষলধারে বৃষ্টি নামায় তারা বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে ও মুসলিম বাহিনী নিরাপদে ফিরে আসে।

৫৭। সারিইয়া যায়েদ বিন হারেছাহ (سرية زيد بن حارثة) : ৭ম হিজরী জুমাদাল আখেরাহ। রোম সম্রাট হেরাক্লিয়াসের নিকটে রাসূলের প্রেরিত দূত ও পত্রবাহক দেহিইয়া কালবী সম্রাট প্রদত্ত উপঢৌকনাদিসহ ফেরার পথে হুসমা (حسمى) নামক স্থানে পৌঁছলে জুযাম (جذام) গোত্রের কিছু লোক তার উপরে হামলা করে সবকিছু ছিনিয়ে নেয়। মদীনায় ফিরে তিনি নিজ গৃহে প্রবেশের আগে রাসূলের দরবারে উপস্থিত হয়ে সব ঘটনা বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তখন যায়েদ বিন হারেছাহ্র নেতৃত্বে ৫০০ সৈন্যের একটি দল হুসমার উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন। তারা জুযাম গোত্রের কিছু লোককে হত্যা করেন এবং ১০০০ উট, ৫০০০ ছাগল ও শ'খানেক নারী ও শিশুকে পাকড়াও করে মদীনায় ফিরে আসেন।

উক্ত গোত্রের সাথে যেহেতু পূর্বেই সন্ধিচুক্তি ছিল এবং অন্যতম গোত্র নেতা যায়েদ সহ কয়েকজন আগেই ইসলাম কবুল করেছিল ও তারা ডাকাত দলের বিরুদ্ধে দেহিইয়াকে সাহায্য করেছিল, সেহেতু যায়েদ বিন রেফা'আহ জুযামী কালবিলম্ব না করে মদীনায় আসেন ও রাসূলের নিকটে সবকিছু বর্ণনা করেন। তখন রাসূল (ছাঃ) তাদেরকে গণীমতের সব মাল ফেরৎ দানের নির্দেশ দেন।

৫৮। সারিইয়া ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (سرية عمر بن الخطاب) : ৭ম হিজরীর শা'বান মাস। হাওয়াযেন গোত্রের বিরুদ্ধে তুরবাহ (تربة) নামক স্থানে ৩০ জনের এই অভিযান প্রেরিত হয়। কিন্তু প্রতিপক্ষ ভয়ে পালিয়ে যায়। ওমর (রাঃ) সেখানে পৌঁছে কাউকে না পেয়ে ফিরে আসেন।

৫৯। সারিইয়া আবুবকর ছিদ্দীক (سرية أبي بكر الصديق) : বনু কেলাব গোত্রের বিরুদ্ধে এই অভিযান প্রেরিত হয়। এরা বনু গাত্বফানের মুহারিব ও আনমার গোত্র সমূহের সহযোগী ছিল এবং মুসলমানদের উপরে হামলার প্রস্তুতি নিচ্ছিল। যুদ্ধে মুসলমানদের জয় হয়। শত্রুদের কিছু নিহত ও কিছু আহত হয়।[৯]

৬০। সারিইয়া বাশীর বিন সা'দ (سرية بشير بن سعد الأنصاري) : ৭ম হিজরীর শা'বান মাস। খায়বরের ফিদাক অঞ্চলের সীমান্তবর্তী বনু মুররাহ গোত্রের বিরুদ্ধে বাশীর বিন সা'দ আনছারীর নেতৃত্বে ৩০ জনের এই সেনাদল প্রেরিত হয়। তিনি সেখানে পৌঁছে কাউকে না পেয়ে কিছু গবাদিপশু খেদিয়ে নিয়ে মদীনা অভিমুখে রওয়ানা হন। কিন্তু রাত্রি বেলায় শত্রুদল পশ্চাদ্ধাবন করে তাদের উপরে অতর্কিতে হামলা করে। এমন সময় তাদের তীর ফুরিয়ে যাওয়ায় সবাই শহীদ হয়ে যান। দলনেতা বাশীর আহত অবস্থায় ফিদাকে নীত হন এবং এক ইহুদীর নিকটে অবস্থান করেন। পরে সুস্থ হয়ে মদীনায় ফিরে আসেন। উল্লেখ্য যে, ফিদাকের ইহুদীদের সাথে ৭ম হিজরীর মুহাররম মাসে খায়বর যুদ্ধের সময় সন্ধিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল।

[ক্রমশঃ]

৯. মুবারকপুরী এটা ধরেননি। মানছুরপুরী সাল-তারিখ ও সেনা সংখ্যা বলেননি।

ইসলামের আলোকে জ্ঞান চর্চা

*ড. মুহাম্মাদ আজিবার রহমান**

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

শিক্ষার মূল ভিত্তি হচ্ছে তাওহীদ বা আল্লাহ্র একত্ব। মানুষের জন্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের সকল শাখাই তাওহীদের ভিত্তিতে গড়তে হবে। তাওহীদ বিরোধী কোন কিছুই মানুষের জন্য শিক্ষার বিষয় হ'তে পারে না। কুরআন ও হাদীছের আলোকে ইহকালীন ও পরকালীন জীবনের প্রয়োজনীয় শিক্ষাই হ'ল প্রকৃত শিক্ষা। এ শিক্ষা অর্জন করা প্রত্যেকের জন্য একান্ত প্রয়োজন। আক্ষরিক জ্ঞান থাকার সাথে সাথে যে শিক্ষা মানুষের ধ্যান-ধারণার পরিবর্তন সাধন করে, আল্লাহ্র বিধিনিষেধ মেনে চলতে সহায়তা করে, সেটাই হ'ল প্রকৃত শিক্ষা।[১০] প্রত্যেক ব্যক্তি মাতৃক্রোড় থেকে মৃত্যু পর্যন্ত নিয়মিত ও অনিয়মিত যে সকল জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অর্জন করে তা সবই শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত। মানুষ হিসাবে যাবতীয় দায়িত্ব পালনের যোগ্য হ'তে হ'লে দৈহিক, মানসিক ও নৈতিক দিক দিয়ে যে জ্ঞান ও গুণাবলী প্রয়োজন তা অর্জনের সুব্যবস্থা করার উদ্দেশ্যে যে প্রচেষ্টা চালাতে হয় তার নামই শিক্ষা।[১১] শিক্ষা হ'ল শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক প্রশিক্ষণ। অন্য কথায় শিক্ষা হচ্ছে, একটি সর্বব্যাপক প্রক্রিয়া, যা শিক্ষার্থীর সামগ্রিক জীবনকে প্রভাবিত করে। এ কারণেই একটি উন্নত সভ্যতা ও জাতীয় জীবন যার উপর অধিক নির্ভরশীল তাই হ'ল প্রকৃত শিক্ষা।[১২]

আল্লামা ইকবালের মতে, 'মানুষের রূহকে উন্নত করার প্রচেষ্টার নামই শিক্ষা'।[১৩] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতে, 'মানুষের অন্তর্নিহিত গুণাবলীর উন্নতি ও বিকাশ সাধনই শিক্ষা'।[১৪] মহাকবি মিল্টন-এর মতে, Education is the harmonious development of body, mind and soul. 'শিক্ষা হচ্ছে শরীর, মন ও আত্মার সুষম উন্নয়ন'।[১৫] Harbert বলেন, Education is the development good moral character. 'শিক্ষা হচ্ছে উত্তম নৈতিক চরিত্রের উন্নয়ন'।[১৬] সুতরাং প্রকৃত শিক্ষা হ'ল মানুষের সার্বিক জীবন পরিচালনার জন্য সামগ্রিক উপাদান সমৃদ্ধ একটি সমন্বিত শিক্ষার নাম। যে শিক্ষার দ্বারা আল্লাহ প্রদত্ত নির্দেশনার আলোকে শিক্ষার্থীর দৈহিক, মানসিক ও আত্মিক পূর্ণ বিকাশ সাধিত হয় অথবা যে শিক্ষা ব্যবস্থায় ইসলামকে একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনাদর্শ হিসাবে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা থাকে তা-ই শিক্ষা। অন্য কথায় মানুষকে আল্লাহ্র সৃষ্ট জীব হিসাবে মনুষ্যত্ব ও মানবিক মূল্যবোধে বিকশিত করে তোলার পাশাপাশি দুনিয়াবী দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে আঞ্জাম দেওয়ার লক্ষ্যে তৈরি করার জন্য পরিচালিত প্রয়াসের নামই শিক্ষা। আর এ শিক্ষা অর্জনই আমাদের কাঙ্খিত লক্ষ্য হওয়া উচিত।

প্রকৃত জ্ঞান অর্জন একটি জাতিকে সর্বতোভাবে জাতীয় জীবনে সকল দিক ও বিভাগে এবং সকল শাখা ও প্রশাখায় সুষ্ঠুভাবে দায়িত্ব পালনের যোগ্য করে গড়ে তোলে। তাকে সকল প্রকার পাশবিক চিন্তা, বিশ্বাস, আচার-আচরণ, স্বভাব-চরিত্র ও কাজ-কর্ম থেকে বিরত রাখে। প্রকৃত শিক্ষা মানব মনে বিশ্বলোক নিহিত সকল শক্তি ও উপকরণ, মানুষের কল্যাণে ব্যবহৃত হওয়ার জন্য সৃষ্টি হয়েছে বলে বিশ্বাস জন্মায় এবং তা সন্ধান ও আহরণ করে সকল মানুষের কল্যাণে প্রয়োগ করতে উদ্বুদ্ধ করে। এ শিক্ষাই মানব মনের যাবতীয় জিজ্ঞাসার নির্ভুল জওয়াব দিয়ে তার অন্তরে দৃঢ় প্রত্যয় সৃষ্টি করে, যা অন্য কোন শিক্ষা দ্বারা সম্ভব নয়। এ শিক্ষা মানুষের জীবনকে সকল অবস্থায় এক আল্লাহ্র আনুগত্যে উদ্বুদ্ধ করার সামর্থ্য দান করে, তাকে পূর্ণাঙ্গ দাসে পরিণত করে এবং অন্য সকল শক্তি ও ব্যক্তির দাসত্ব থেকে তাকে মুক্ত করে। এ শিক্ষা মানুষকে আল্লাহ্র একান্ত অনুগত বান্দা হ'তে সহায়তা করে। এ শিক্ষাই মানুষের জন্য মুক্তির সনদ। তাই মুসলিম জাতির ঐক্য গড়ে তোলা এবং মুসলিম জাতিরূপে তাকে রক্ষা করা কেবল এ শিক্ষার মাধ্যমেই সম্ভব।

ইবাদতের ক্ষেত্রে ধর্মীয় শিক্ষার গুরুত্ব অনস্বীকার্য। এ শিক্ষা ব্যবস্থা একই সাথে দ্বীন ও দুনিয়ার উভয়বিধ প্রয়োজন পূরণে সক্ষম। জাগতিক প্রয়োজনকে উপেক্ষা করে কেবলমাত্র ব্যক্তি জীবনে ছালাত, ছিয়াম ইত্যাদি পালন করার উপযোগী শিক্ষাকে পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা বলা যায় না। বরং দুনিয়ায় সুষ্ঠুভাবে জীবনযাপনের প্রয়োজনে মানুষের জন্য যে শিক্ষা অপরিহার্য, তাকে যদি ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গিতে পরিবেশন করা যায়, তবে তা-ই হবে প্রকৃত শিক্ষা। মহানবী (ছাঃ) বলেন, اَلنَّاسُ مَعَادِنُ كَمَعَادِنِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ فَخِيَارُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الْإِسْلَامِ إِذَا

---

*. *সহকারী অধ্যাপক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, দারুল ইহসান ইউনিভার্সিটি, বারিধারা ক্যাম্পাস, ঢাকা।*

১০. *ড. মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান, 'শিক্ষা ব্যবস্থা ইসলামীকরণ', মাসিক পৃথিবী, বর্ষ ২৫, সংখ্যা-১, অক্টোবর-২০০৫ (ঢাকা : বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার), পৃঃ ৩৬।*

১১. *তদেব।*

১২. *তদেব।*

১৩. *মুহাম্মদ আবদুর রব মিয়া আল-বাগদাদী, আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা: একটি পর্যালোচনা, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন পত্রিকা, ৪১ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, এপ্রিল-জুন ২০০২ (ঢাকা: ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ), পৃঃ ২১।*

১৪. *তদেব।*

১৫. *মুহা. হাফিজুর রহমান ফয়সাল, ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা : সময়ের অপরিহার্য দাবি, মাসিক মাদরাসা, বর্ষ ৫, সংখ্যা ১০ম (ঢাকা: ২০০১), পৃঃ ৪২।*

১৬. *তদেব।*

فَقِهُوْا– ‘সোনা-রূপার খনির মত মানুষও (বিভিন্ন প্রকারের) খনি। তাদের মধ্যে যারা ইসলাম গ্রহণের পূর্বে উত্তম, দ্বীনের সঠিক জ্ঞান লাভ করতে পারলে ইসলাম গ্রহণের পর তারাই উত্তম হয়ে থাকে’।[১৭] আল্লাহ্ তা‘আলা বলেন, إِنَّمَا يَخْشَى اللهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ– ‘তাঁর বান্দাদের মধ্যে জ্ঞানীরাই কেবল তাঁকে ভয় করে’ *(ফাতির ২৮)*। তিনি আরো বলেন, وَمَا يَعْقِلُهَا إِلاَّ الْعَالِمُوْنَ ‘কেবল জ্ঞানী ব্যক্তিরাই উহা অনুধাবন করে থাকে’ *(আনকাবূত ৪৩)*। তিনি আরো বলেন, يَرْفَعِ اللهُ الَّذِيْنَ آمَنُوْا مِنْكُمْ وَالَّذِيْنَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ– ‘তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান আনয়ন করেছে এবং যাদেরকে জ্ঞান দান করা হয়েছে আল্লাহ তাদেরকে উন্নীত করবেন, তোমরা যা কর আল্লাহ সে সম্পর্কে সবিশেষ অবহিত’ *(মুজাদালাহ ১১)*।

শিক্ষার সাথে ধর্মের সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড়। ইসলামের একমাত্র ধর্মগ্রন্থ আল-কুরআন। এর আভিধানিক অর্থ আবৃত্তি করা বা পাঠ করা।[১৮] মানুষ হিসাবে মানবিক গুণাবলীর বিকাশ সাধনের মাধ্যমে মহান প্রভু আল্লাহ তা‘আলার সাথে সম্পর্ক স্থাপন করা, তাঁর প্রদত্ত বিধান অনুযায়ী জীবন যাপন করা, পার্থিব জগতে সুখ-শান্তির পরিবেশ সৃষ্টি করা এবং আখিরাতে চিরন্তন শান্তি হাছিল করার জন্য ইসলামী জ্ঞানার্জন করা আবশ্যক। মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্যই আল্লাহ্র ইবাদত করা বা তাঁর নির্দেশ মেনে চলা। আল্লাহ বলেন, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ– ‘আমি জিন ও মানুষকে একমাত্র আমার ইবাদতের উদ্দেশ্যেই সৃষ্টি করেছি’ *(যারিয়াত ৫৬)*। দু’টি কারণে জ্ঞানকে ইবাদতে ইলাহীর উপরে স্থান দেয়া যরূরী। ১. এর দ্বারাই ইবাদতের পথ নির্দিষ্ট করা হয়; ২. এর দ্বারাই প্রতিবন্ধকতা ও বাধা সৃষ্টিকারী বস্তুসমূহ থেকে নিজেকে নিরাপদ রাখা যায়। প্রথমে প্রকৃত মা‘বূদকে জানতে হবে। তারপর তাঁর ইবাদত করা ওয়াজিব ও যরূরী।[১৯]

আবু হামেদ মুহাম্মাদ গাযযালী তাঁর মিনহাজুল আবেদীন গ্রন্থে বলেন, ‘আল্লাহ্র কসম! ইলম ব্যতীত যারা আল্লাহ্র ইবাদতে লিপ্ত, তাদের জন্য সত্যিই এটা মারাত্মক বিপদের স্থান, হতাশা এবং আফসোসের স্থান’।[২০] তাই আল্লাহ্র নির্দেশ মেনে চলার জন্য ইসলামী জ্ঞানার্জনের প্রয়োজন সর্বাধিক। বিশ্বের অমুসলিম বরেণ্য শিক্ষাবিদ, মনীষী এবং শিক্ষা বিজ্ঞানীরা ধর্মকে শিক্ষার সাথে সম্পৃক্ত করার পক্ষে মতামত ব্যক্ত করেছেন। বিশিষ্ট শিক্ষা বিজ্ঞানী স্ট্যানলী হল (Stanly Hall) দ্ব্যর্থহীনভাবে ধর্মীয় জ্ঞানার্জনের পক্ষে মত দিয়ে বলেন, ‘If you teach their the three 'R's, Reading, Writing and Arithmetic and don't teach the fourth 'R' Religion, they are sure to become fifth 'R' Rascal. ‘যদি তুমি তাদেরকে (শিশুদেরকে) তিনটি ‘আর’ তথা পড়া, লেখা ও গণিত শিক্ষা দাও এবং ৪র্থ ‘আর’ তথা ধর্ম শিক্ষা না দাও, তাহ’লে অবশ্যই তারা পঞ্চম ‘আর’ তথা ‘বেয়াদব’ হবে’।[২১] মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রখ্যাত দার্শনিক ও চিন্তাবিদ Albert Scezer তাঁর একটি গ্রন্থে শিক্ষার সাথে ধর্মের সম্পর্ক নির্ণয় করতে গিয়ে বলেন, Three kinds of progress are significant; progress of knowledge and technology, progress in socialigation of man, progress in spiritualilty.[২২]

জ্ঞান অর্জনের জন্য ইসলামের প্রাথমিক যুগে তেমন কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল না। ইসলামের আদি শিক্ষাগার ছিল মসজিদ। আদম (আঃ) দুনিয়াতে অবতীর্ণ হয়ে বায়তুল্লাহ বা পবিত্র কা‘বা গৃহ নির্মাণ করেন। এটিই মানব জাতির প্রথম শিক্ষাগার।[২৩] ইসলাম প্রচারের সূচনা থেকেই মহানবী (ছাঃ) মানব জাতির মহান শিক্ষকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন এবং ইসলামী শিক্ষার নিয়মনীতি প্রবর্তন করেন। তিনি নবুঅত লাভের পর কা‘বাকে প্রথম শিক্ষায়তন হিসাবে ব্যবহার করেন। পরে তিনি মক্কা নগরীর ছাফা পাহাড়ের পাদদেশে আরকাম বিন আবুল আরকামের বাড়ীতে ‘দারুল আরকাম’ নামে একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। রাসূল (ছাঃ) নিজেই এ প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ছিলেন। এ স্থানে তিনি আবুবকর (রাঃ), ওমর (রাঃ), ওছমান (রাঃ), আলী (রাঃ) সহ নবদীক্ষিত শিষ্যদের ইসলামের বিধিবিধান শিক্ষা দিতেন।[২৪] ৬২২ খৃষ্টাব্দে হিজরতের পর মদীনায় ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে ইসলামী শিক্ষার ব্যাপক প্রচার-প্রসার শুরু হয়। মদীনায় শিক্ষার সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা গড়ে ওঠার সাথে সাথে পার্শ্ববর্তী অঞ্চলেও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠতে থাকে। নবী করীম (ছাঃ)-এর জীবদ্দশায়ই মদীনা এবং তৎসংলগ্ন এলাকায় ৯টি মসজিদ তৈরি হয়। মহানবী (ছাঃ) সর্বপ্রথম মদীনা থেকে ৬ মাইল উত্তরে ‘কুবা’ নামক স্থানে একটি মসজিদ নির্মাণ করেন।[২৫] মদীনা

১৭. *মুসলিম, মিশকাত হা/২০১।*
১৮. *সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ, ১ম খণ্ড, (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৮৬), পৃ. ৩৩০।*
১৯. *মিনহাজুল আবেদীন, পৃ. ৩।*
২০. *ঐ, পৃ. ৭।*
২১. *তদেব।*
২২. *তদেব।*
২৩. *ইতিহাসের আলোকে আমাদের শিক্ষার ঐতিহ্য ও প্রকৃতি, পৃ. ১১।*
২৪. *ড. মো. আবদুস সাত্তার, বাংলাদেশে মাদরাসা শিক্ষা ও সমাজ জীবনে তার প্রভাব, (ঢাকা: ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৪), পৃ. ৪৩।*
২৫. *ড. আবদুল ওয়াহিদ, বাংলাদেশে ইসলামী শিক্ষা প্রত্যাশা ও প্রাপ্তি, (ঢাকা : ইসলামী সাংস্কৃতিক পরিষদ, ২০০১), পৃ.২৭।*

থেকে আনুমানিক ৯ মাইল দক্ষিণে 'নাকিউল খাজামাত' নামক স্থানে আসাদ বিন যুরারাহ (রাঃ)-এর বাড়ীতে একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। মসজিদ-ই বনি যুরায়েখ নামে মদীনায় একটি মসজিদ ও মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন। মদীনা নগরীর প্রাণকেন্দ্র 'কালব' নামক স্থানে এটি অবস্থিত। রাফে' বিন মালিক জারকী আনছারী (রাঃ) এ প্রতিষ্ঠানের ইমাম ও শিক্ষক ছিলেন। এখানে কুরআন পঠন-পাঠন ও ইসলামের মৌলিক বিষয়াবলী শিক্ষা দেওয়া হ'ত।[২৬] এরপর মহানবী (ছাঃ) মদীনায় মসজিদে নববী প্রতিষ্ঠা করেন।[২৭] এ সকল মসজিদে ছালাত আদায়ের পাশাপাশি ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হ'ত। ফলে ইসলামের বুনিয়াদ শক্তিশালী হয় এবং ইসলামী জ্ঞানার্জনের পথ সুগম হয়।

মহানবী (ছাঃ) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মসজিদে নববী অল্পদিনের মধ্যেই মুসলমানদের কেন্দ্রীয় শিক্ষায়তনে রূপ লাভ করে। রাসূল (ছাঃ) মসজিদে নববীর 'সতুনে আবু লুবাবা' নামক থামের গোড়ায় বসে কুরআনের দরস পেশ করতেন।[২৮] ছাহাবায়ে কেরাম ছালাত আদায় ছাড়াও কুরআন, হাদীছ অধ্যয়ন করতেন এবং ধর্মীয় বিধান, বিভিন্ন জাতির ইতিহাস ও ভাষা শিক্ষা গ্রহণ করতেন।[২৯] পরবর্তীতে মদীনার ছোট-বড় মসজিদ-মাদরাসা সমূহ এ কেন্দ্রের সাথে সম্পৃক্ত হয়। প্রথমদিকে মসজিদই শিক্ষাদান ও শিক্ষা গ্রহণের জন্য ব্যবহৃত হ'ত। পরবর্তীতে মসজিদের পাশে মক্তব, মাদরাসা, গ্রন্থাগার, ছাত্র-শিক্ষকদের বাসস্থান ইত্যাদি নির্মিত হয়। অনেক প্রাচীন মসজিদের ধ্বংসাবশেষে ছাত্র-শিক্ষকদের পৃথক কক্ষের নিদর্শন এখনো পাওয়া যায়।[৩০] আল্লামা শিবলী নো'মানী বলেন, মদীনার তৎকালীন মসজিদে নববী ইসলামের পূর্ণাঙ্গ দরসগাহ ছিল এবং এটিই আল্লাহ তা'আলার ইবাদতের স্থান ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রাণকেন্দ্র ছিল।

মদীনায় ইসলামী তা'লীম প্রদানের বিভিন্ন রূপ পদ্ধতি প্রচলিত ছিল। তন্মধ্যে একটি পদ্ধতি ছিল এই যে, বিভিন্ন গোত্রের কিছু লোক ১০ কিংবা ২০ দিন অথবা ১ বা ২ মাস ধরে মদীনাতে অবস্থান করতেন এবং ইসলামী আক্বীদাহ ও যরূরী মাসআলাসমূহ শিখে নিজেদের গোত্রের লোকদের নিকট ফিরে গিয়ে তাদেরকে তা শিক্ষা দিতেন। আরেকটি পদ্ধতি ছিল, কিছু সংখ্যক লোক মদীনায় স্থায়ীভাবে অবস্থান করে শরী'আতের বিধি-বিধান ও হুকুম-আহকাম বিষয়ে তা'লীম গ্রহণ করতেন এবং তা লোকদেরকে শিক্ষা দিতেন।[৩১] মসজিদে নববীর সাথে আছহাবে ছুফফার ব্যবস্থা ছিল। আবু হুরায়রা (রাঃ)-এর বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, আছহাবে ছুফফার শিক্ষার্থী সংখ্যা ছিল ৭০ জন। তাঁরা সার্বক্ষণিক শিক্ষাকেন্দ্রে উপস্থিত থেকে কুরআন পাঠ, ইসলামের বিধিবিধান এবং প্রাত্যহিক জীবন বিধানের খুঁটিনাটি বিষয় রাসূল (ছাঃ) থেকে শিক্ষা লাভ করতেন। আবু হুরায়রা (রাঃ), মু'আয বিন জাবাল (রাঃ), আবু যর গিফারী (রাঃ) প্রমুখ বিদ্যোৎসাহী ছাহাবী ছিলেন এ প্রতিষ্ঠানের অন্যতম ছাত্র।[৩২]

মহানবী (ছাঃ) শুধু মক্কা ও মদীনাতেই শিক্ষাকেন্দ্র গড়ে তোলেননি; বরং তিনি ছাহাবীগণকে ইসলামী শিক্ষা বিস্তারের জন্য দূর দূরান্তে অবস্থিত বিভিন্ন দেশে পাঠিয়ে দিতেন। এ উদ্দেশ্যে তিনি মক্কায় ২৬ জন, কুফায় ৫১ জন, মিসরে ১৬ জন, খুরাসানে ৬ জন ও জাযীরায় ৩ জন ছাহাবীকে প্রেরণ করেন।[৩৩] জ্ঞান বিস্তারের জন্য তিনি বিভিন্ন মসজিদে শিক্ষিত ব্যক্তিদের প্রেরণ করতেন। যেমন- প্রখ্যাত ছাহাবী মু'আয বিন জাবাল (রাঃ)-কে তিনি সিরিয়ায় প্রেরণ করেন। তিনি সেখানে মসজিদে মসজিদে বক্তৃতাদানের মাধ্যমে অশিক্ষিত মানুষকে জ্ঞানের আলো ছড়িয়ে দিতেন।[৩৪] মহানবী (ছাঃ) প্রবর্তিত শিক্ষার এ ধারা তাঁর তিরোধানের পরও অব্যাহত থাকে।

ওমর (রাঃ) (৬৩৪-৪৪ খৃঃ) মসজিদ ভিত্তিক প্রাথমিক শিক্ষাদানের সাথে সাথে লিখনীরও ব্যবস্থা করেন। তিনি সপ্তম শতাব্দীতে সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে কুরআন বিশেষজ্ঞদের প্রেরণ করেন। তাঁরা মসজিদে কুরআন-হাদীছের বক্তৃতা দিতেন। এসব বক্তৃতাকে 'মাওইযা' বলা হ'ত।[৩৫] এ সকল বক্তৃতা শ্রবণের জন্য খলীফা ওমর (রাঃ) জনগণকে কঠোরভাবে নির্দেশ দিতেন। তিনি রাজ্যের সর্বত্র মক্তব প্রতিষ্ঠা করে তাতে যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষক নিযুক্ত করেন এবং বায়তুলমাল থেকে তাদের ভাতা প্রদানের ব্যবস্থা করেন। এমনকি তিনি আরবী সাহিত্য ও আরবী ভাষা শিক্ষা করাকে বাধ্যতামূলক করে ফরমান জারী করেন।[৩৬] তিনি প্রত্যেক মুসলমানের জন্য অতি প্রয়োজনীয় সূরাগুলি শিক্ষা করা বাধ্যতামূলক ঘোষণা করেন। তাছাড়া

---

২৬. *বাংলাদেশে মাদরাসা শিক্ষা ও সমাজ জীবনে তার প্রভাব, পৃ. ৪৫-৪৬।*
২৭. *মিহাজুল আবেদীন, পৃ. ৩।*
২৮. *ঐ, পৃ. ৫০।*
২৯. *M. Mohar Ali, History of Muslims of Bengal, Vol-1 (Riyad: Imam Muhammad Ibn Sa'ud Islamic University, 1985), P. 828.*
৩০. *আবদুল হক ফরিদী, মাদ্রাসা শিক্ষা বাংলাদেশ, (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮৫), পৃ. ১৩।*
৩১. *বাংলাদেশে মাদরাসা শিক্ষা ও সমাজ জীবনে তার প্রভাব, পৃ. ৫১।*
৩২. *ঐ, পৃ. ৫২।*
৩৩. *গোলাম আহমদ মোর্তজা, চেপে রাখা ইতিহাস, (বর্ধমান: বিশ্ববঙ্গীয় প্রকাশন, ৭ম সংস্করণ, ১৯৯৮), পৃ. ৩০।*
৩৪. *মোঃ ইসমাইল মিয়া, খুলাফা-ই-রাশেদীনের আমলে শিক্ষা ব্যবস্থা, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন পত্রিকা, ৪৩ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, অক্টোবর-ডিসেম্বর, (ঢাকা: ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৩), পৃ. ১৩৫-৩৬।*
৩৫. *ইতিহাসের আলোকে আমাদের শিক্ষার ঐতিহ্য ও প্রকৃতি, পৃ. ২৮।*
৩৬. *বাংলাদেশে মাদরাসা শিক্ষা ও সমাজ জীবনে তার প্রভাব, পৃ. ৫৮।*

প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের নির্দেশ প্রদান করেন যেন প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে ভাতা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়।[৩৭] ইসলামী শিক্ষার প্রচার-প্রসারের জন্য মদীনায় আয়েশা (রাঃ), আব্দুল্লাহ্ ইব্ন ওমর (রাঃ), আবু হুরায়রা (রাঃ); মক্কায় আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ); কূফায় আলী (রাঃ), আব্দুল্লাহ্ বিন মাসউদ (রাঃ), আনাস ইবনু মালিক (রাঃ); বসরায় আবু মূসা আল-আশ'আরী (রাঃ); সিরিয়ায় আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ); মিসরে আমর ইবনুল আছ (রাঃ); দামিস্কে আবুদ দারদা (রাঃ) প্রমুখ ছাহাবীগণকে দায়িত্ব অর্পণ করা হয়।[৩৮]

ওছমান (রাঃ) (৬৪৪-৬৫৩) ইসলামী সাম্রাজ্যে কুরআনিক শিক্ষা বিস্তারের লক্ষ্যে পূর্ববর্তী খলীফাদের অনুকরণে মসজিদে মসজিদে সুনির্দিষ্ট নিয়মে বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করেন। তিনি মক্কা, মদীনা, কূফা, বসরা প্রভৃতি স্থানে দারস দানের নতুন নতুন কেন্দ্র গড়ে তোলেন। কুরআন-হাদীছের জ্ঞানে প্রসিদ্ধ ব্যক্তিদের দ্বারা বক্তৃতার ব্যবস্থা করে শিক্ষার্থীদের মধ্যে জ্ঞান বিস্তারের আয়োজন করেন। তিনি রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে মসজিদ ও অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। মদীনায় মাদরাসা-ই ওছমান (রাঃ) আজও তাঁর স্মৃতি বহন করে চলেছে। তিনি বহু সংখ্যক ছাহাবীকে শিক্ষকতার কাজে নিয়োজিত করেন। তাঁর আমলের শিক্ষা ব্যবস্থা ইসলামের ইতিহাসে ভাস্বর হয়ে আছে। মানুষ যাতে সঠিকভাবে মহাগ্রন্থ আল-কুরআন পড়তে পারে সেজন্য মহানবী (ছাঃ)-এর সংরক্ষিত কুরআনের পাণ্ডুলিপি হাফছা (রাঃ)-এর নিকট থেকে সংগ্রহ করে তা সাজিয়ে সংকলন করেন এবং অন্যান্য পাণ্ডুলিপি পুড়িয়ে ফেলেন; যাতে করে অন্যান্য আসমানী কিতাবের মত আল-কুরআনের কোন রকম সংযোজন-বিয়োজন কিংবা পরিবর্তন-পরিবর্ধন করার সুযোগ না থাকে।[৩৯]

ইসলামের চতুর্থ খলীফা আলী (রাঃ) (৬৫৬-৬৬৯)-এর শাসনামলে মুসলিম সাম্রাজ্যে শিক্ষার ব্যাপক প্রসার ঘটে। তিনি নিজেই মদীনার মসজিদে সাপ্তাহিক বক্তৃতা দিতেন।[৪০] তিনি আরবী গদ্যের জনক ছিলেন। তাঁর রচিত 'দীওয়ান-ই আলী' আরবী সাহিত্যের এক উল্লেখযোগ্য সংযোজন। তাঁর আমলে মসজিদই শিক্ষার শ্রেষ্ঠ কেন্দ্র ছিল। তিনি রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে শিক্ষা প্রসারের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন। তন্মধ্যে মসজিদে মসজিদে কুরআন শিক্ষার কর্মসূচী ছিল অন্যতম। তিনি মক্কা, মদীনা, কূফা, বসরা প্রভৃতি স্থানে নতুন নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্মাণ করেছিলেন। কূফায় আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রাঃ), তায়েফে আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ), মদীনায় আবু হুরায়রা (রাঃ), আয়েশা (রাঃ) ও মক্কায় আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন।[৪১]

এভাবে সম্মুখে অগ্রসর হয় উম্মতে মুহাম্মাদীর শিক্ষার ইতিহাস। অতঃপর ধীরে ধীরে সমগ্র পৃথিবীতে তা ছড়িয়ে পড়ে। ছাহাবায়ে কেরাম এবং তাদের উত্তরসূরীরা পৃথিবীর সকল মানবতার দুয়ারে দুয়ারে নিয়ে যান ইসলামের সুমহান শিক্ষা। যেখানেই তারা গেছেন সেখানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে মানুষ গড়ার কেন্দ্র, প্রজ্জ্বলিত হয়েছে জ্ঞানের আলো; এক নতুন সভ্যতা-সংস্কৃতি মানুষের মধ্যে জাগিয়ে তুলেছে প্রাণচাঞ্চল্য।

উপরের আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, মানবজীবনে নৈতিক গুণাবলী অর্জনের জন্য কুরআন ও হাদীছের যথার্থ শিক্ষা অর্জন করা অপরিহার্য। ইসলামের দৃষ্টিতে শিক্ষা জীবনের সকল দিক ও বিভাগ সংক্রান্ত হ'তে হবে। এক্ষেত্রে দ্বীন ও দুনিয়া বা অন্য কোন দিক দিয়েও কোন ব্যবধান থাকবে না। জীবন ও জগতের সমগ্র দিকই শিক্ষার আওতার মধ্যে আনতে হবে। তাকে বৈষয়িক ও নৈতিক জীবনে সর্বপ্রকার সমস্যার সমাধান হ'তে হবে। মানুষের জন্য এমন একটি যুগোপযোগী ও বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত শিক্ষা ব্যবস্থা প্রয়োজন যার মাধ্যমে জাতি একই সাথে মানবিক ও আত্মিক উৎকর্ষতায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠতে পারে। এ দিকটি সামনে রেখে জাতিকে শিক্ষার আলোয় উদ্ভাসিত করে তুলতে হ'লে প্রথমেই প্রয়োজন একটি সুসমন্বিত শিক্ষা ব্যবস্থার প্রচলন ও উন্নয়ন। এর মাধ্যমেই সম্ভব জাতিকে সঠিক শিক্ষায় শিক্ষিত করা।

প্রকৃত শিক্ষায় তৈরি হয় পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানুষ। আবুবকর, ওমর, ওছমান, আলী (রাঃ) সহ অসংখ্য মানুষ এ শিক্ষার ফসল। এ শিক্ষা খালিদ বিন ওয়ালীদ, মূসা বিন নুসাইর, তারিক বিন যিয়াদ, মুহাম্মাদ বিন কাসিমের মত বহু বীর সেনানী ও শিক্ষাবিদ তৈরি করেছে, যারা ছিলেন যুগের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত অথচ সৃষ্টিকর্তার প্রতি নিবেদিত। এ শিক্ষায় তরুণ হয় দায়িত্বশীল, কুরআন তার মন ও মননের পরিপূর্ণ ও পরিশুদ্ধ বিকাশের সঠিক ব্যবস্থা করে থাকে।

পরিশেষে বলতে চাই, সকল জ্ঞানের মূল হ'ল আল্লাহ্র প্রতি নিরংকুশ আনুগত্য। আর আনুগত্য সৃষ্টি হবে সঠিক জ্ঞানার্জনের মাধ্যমে। তাই ইহকালীন কল্যাণ ও পরকালীন মুক্তির স্বার্থে এবং দেশ ও জাতির বৃহত্তর কল্যাণের জন্য আমাদের প্রকৃত জ্ঞান চর্চায় সচেষ্ট হওয়া উচিত। যে জ্ঞান আমাদেরকে ছিরাতে মুস্তাকীমের পথ দেখাবে নিরন্তর। মহান আল্লাহ আমাদের তাওফীক দান করুন- আমীন!

৩৭. ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৫-৩৬।
৩৮. বাংলাদেশে মাদরাসা শিক্ষা ও সমাজ জীবনে তার প্রভাব, পৃ. ৫৮।
৩৯. ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, পৃ. ১৩৭-৩৮।
৪০. ইতিহাসের আলোকে আমাদের শিক্ষার ঐতিহ্য ও প্রকৃতি, পৃ. ২৯।
৪১. ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৮-৩৯।

মানব জাতির প্রকাশ্য শত্রু শয়তান

*-মুহাম্মাদ আবদুল ওয়াদূদ**

আল্লাহ তা'আলা আদম (আঃ)-কে সৃষ্টি করে জান্নাতে স্থান দিয়েছিলেন। কিন্তু শয়তানের প্ররোচনায় আল্লাহ্র আদেশ অমান্য করার কারণে দুনিয়াতে নামিয়ে দিলেন। আর শয়তানকে মানুষের শত্রু হিসাবে পাঠিয়ে দিলেন। শয়তান আল্লাহ্র সাথে চ্যালেঞ্জ করেছিল যে, সে মানুষকে ধোঁকা দিয়ে তাদের অধিকাংশকে জাহান্নামে নিয়ে যাবে। শয়তানকে মানুষের জন্য পরীক্ষা স্বরূপ সৃষ্টি করা হয়েছে। এই পরীক্ষাতে যারা পাশ করবে তাদের জন্য পরকালে রয়েছে জান্নাত। আর ফেল করলে পরিণাম হবে জাহান্নাম।

শয়তান দুনিয়ার মানুষকে বিভ্রান্ত করেছে নানাভাবে। খারাপকে ভাল বানিয়ে তার অনুসরণ করাচ্ছে এবং আল্লাহ্র বিধান থেকে দূরে নিয়ে যাচ্ছে। ব্যক্তি জীবন থেকে আরম্ভ করে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সকল জীবনে আমরা আল্লাহ্র বিধান থেকে অনেক দূরে ও শয়তানের বিধানের খুব কাছে অবস্থান করছি। অধিকাংশ মানুষ জানেই না যে কোন্‌টি ভাল কাজ আর কোন্‌টি শয়তানের কাজ। এই অজানাকে পুঁজি করে শয়তান মানুষকে বিভ্রান্ত করার প্রচেষ্টায় আল্লাহ্র ইবাদত থেকে দূরে রাখার কাজে ব্যস্ত। তাই আমাদেরকে শত্রু সম্পর্কে জানতে হবে, তার কাজ সম্পর্কে অবহিত হ'তে হবে ও শয়তানের চক্রান্ত থেকে বাঁচার চেষ্টা করতে হবে।

শয়তানের পরিচয় :

আদম (আঃ)-কে সৃষ্টির আগে পৃথিবীতে যে জিন জাতি বাস করত 'ইবলীস' ছিল তাদের অন্যতম *(কাহাফ-৫০)*। শাহর ইবনু হাওশাব (রহঃ) বলেন, 'ইবলীস জিন দলভুক্ত ছিল। যখন তারা পৃথিবীতে হাঙ্গামা সৃষ্টি করে, তখন আল্লাহ তা'আলা তাদের নিকট ফেরেশতাদের প্রেরণ করেন। ফেরেশতাগণ তাদের কতককে হত্যা করেন, কতককে বিভিন্ন দ্বীপে নির্বাসন দেন এবং কতককে বন্দী করেন। ইবলীস ছিল বন্দীদের একজন। ফেরেশতাগণ তাকে ধরে সঙ্গে করে আকাশে নিয়ে যান এবং সে সেখানেই রয়ে যায়'।[৪২] সে ছিল আগুনের সৃষ্টি *(আর-রহমান ১৫; হিজর ২৭)*। আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, خُلِقَتِ الْمَلاَئِكَةُ مِنْ نُوْرٍ وَخُلِقَ الْجَانُّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ 'ফেরেশতাদেরকে নূর থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। আর জিনদেরকে আগুনের শিখা থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে'।[৪৩] মুহাম্মাদ ইবনু ইসহাক (রহঃ) ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, 'পাপে লিপ্ত হওয়ার পূর্বে ইবলীসের নাম ছিল 'আযাযীল'। সে ছিল পৃথিবীর বাসিন্দা। অধ্যবসায় ও জ্ঞানের দিক থেকে ফেরেশতাদের মধ্যে সেই ছিল সকলের সেরা'।[৪৪]

অতঃপর যখন আল্লাহ আদম (আঃ)-কে সৃষ্টি করে ফেরেশতাদেরকে নির্দেশ দিলেন তাকে সিজদা করার জন্য তখন সকল ফেরেশতা সিজদা করল কিন্তু ইবলীস সিজদা করল না। আল্লাহ বলেন, 'স্মরণ কর, যখন তোমার প্রতিপালক ফেরেশতাদেরকে বলেছিলেন, আমি মানুষ সৃষ্টি করছি কাদা মাটি থেকে। যখন আমি তাকে সুষম করব এবং তাতে আমার রূহ সঞ্চার করব, তখন তোমরা তার প্রতি সিজদাবনত হবে। তখন ফেরেশতারা সকলেই সিজদাবনত হ'ল কেবল ইবলীস ব্যতীত। সে অহংকার করল এবং কাফিরদের অন্তর্ভুক্ত হ'ল। তিনি বললেন, হে ইবলীস! আমি যাকে নিজ হাতে সৃষ্টি করলাম, তার প্রতি সিজদাবনত হ'তে তোমাকে কিসে বাধা দিল? তুমি কি ঔদ্ধত্য প্রকাশ করলে? না তুমি উচ্চ মর্যদাসম্পন্ন? সে বলল, আমি তাঁর চেয়ে শ্রেষ্ঠ। আপনি আমাকে আগুন থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং তাকে সৃষ্টি করেছেন কাদা মাটি থেকে। তিনি (আল্লাহ) বললেন, তুমি এখান থেকে বের হয়ে যাও। নিশ্চয়ই তুমি বিতাড়িত এবং তোমার উপর আমার লা'নত স্থায়ী হবে কর্মফল দিবস পর্যন্ত। সে বলল, হে আমার প্রতিপালক! আপনি আমাকে অবকাশ দিন পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত। তিনি বললেন, তুমি অবকাশ প্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হ'লে অবধারিত সময় উপস্থিত হওয়ার দিন পর্যন্ত। সে বলল, আপনার সম্মানের শপথ! আমি তাদের সকলকেই পথভ্রষ্ট করব। তবে তাদের মধ্যে একনিষ্ঠ বান্দাদের নয়। তিনি বললেন, তবে এটাই সত্য আর আমি সত্যই বলি। তোমার দ্বারা ও তোমার অনুসারীদের দ্বারা আমি জাহান্নাম পূর্ণ করবই' *(ছোয়াদ-৩৮/৭১-৮৫)*। উক্ত ঘটনাটি বিভিন্ন ভাবে কুরআনের সূরা বাক্বারাহ, আ'রাফ, হিজর, বনী ইসরাঈল, ত্বা-হা ও ছোয়াদে বর্ণিত হয়েছে।

আদমকে সিজদা না করার কারণে আল্লাহ ইবলীসকে জান্নাত থেকে বের করে দেন। আদম ও হাওয়াকে জান্নাতে থাকার আদেশ দেন এবং তাদেরকে জান্নাতের সকল নে'মত ভোগ করার অনুমতি দেন কেবল একটি বৃক্ষ ছাড়া। শয়তান আদম ও হাওয়াকে বিভিন্নভাবে আল্লাহ্র আদেশ

* তুলাগাঁও, সুলতানপুর, দেবিদ্বার, কুমিল্লা।

৪২. *হাফিয ইবনু কাছীর, আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ, ১ম খণ্ড (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১ম প্রকাশ, জুন ২০০০), পৃঃ ১৮৩।*

৪৩. *মুসলিম হা/২৯৯৬; মুসনাদে আহমাদ হা/২৪৮২৬; রিয়াযুছ ছালেহীন হা/১৮৪৬; মিশকাত হা/৫৭০১ 'সৃষ্টির সূচনা ও নবীদের আলোচনা' অনুচ্ছেদ।*

৪৪. *আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৪২।*

অমান্য করার জন্য কুমন্ত্রণা দিতে থাকে। সে আদম (আঃ)-কে এই বলে কুমন্ত্রণা দিল যে, 'হে আদম! আমি কি তোমাকে বলে দেব অনন্ত জীবনপ্রদ বৃক্ষের কথা এবং অক্ষয় রাজ্যের কথা?' *(ত্বা-হা ১২০)*। সে আরো বলল, আল্লাহ তোমাদেরকে এই গাছের ফল খেতে নিষেধ করেছেন, কারণ যদি তোমরা ফল খাও তাহ'লে তোমার ফেরেশতা হয়ে যাবে, না হয় চিরস্থায়ী হয়ে যাবে। সুতরাং জান্নাতে চিরস্থায়ী হ'তে হ'লে এ বৃক্ষের ফল খাও' *(আ'রাফ ২০-২২)*। শয়তানের চক্রান্তে পড়ে আদম ও হাওয়া (আঃ) এক সময় নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল খেয়ে ফেলেন। তখন আল্লাহ ডেকে বলেন,

وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُل لَّكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ، قَالاَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخَاسِرِيْنَ-

'তখন তাদের প্রতিপালক তাদেরকে ডেকে বললেন, আমি কি তোমাদেরকে এ বৃক্ষের নিকটবর্তী হ'তে বারণ করিনি এবং আমি কি তোমাদেরকে বলিনি যে, শয়তান তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু? তারা বলল, হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা নিজেদের প্রতি অত্যাচার করেছি, যদি আপনি আমাদেরকে ক্ষমা না করেন এবং দয়া না করেন তবে অবশ্যই আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব' *(আ'রাফ ৭/২২-২৩)*।

আল্লাহ পাক আদম ও হাওয়া (আঃ)-এর অপরাধ ক্ষমা করে জান্নাত থেকে দুনিয়ায় নামিয়ে দিলেন এবং শয়তানকে মানুষের জন্য শত্রু করে দিলেন। আর মানব জাতির জন্য নির্দেশ দিয়ে দিলেন,

قُلْنَا اهْبِطُواْ مِنْهَا جَمِيْعاً فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّيْ هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُوْنَ، وَالَّذِيْنَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِآيَاتِنَا أُوْلَـئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خَالِدُوْنَ-

'আমি বললাম, তোমরা সকলেই এ স্থান থেকে নেমে যাও। পরে যখন আমার পক্ষ থেকে তোমাদের নিকট সৎপথের কোন নির্দেশ আসবে, তখন যারা আমার সৎপথের অনুসরণ করবে, তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না। যারা কুফরী করে ও আমার নিদর্শনসমূহকে অস্বীকার করে তারাই জাহান্নামী। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে' *(বাক্বারাহ ২/৩৮-৩৯)*।

এই হ'ল শয়তান যাকে আমাদের আদি পিতা আদম (আঃ)-এর পূর্বে সৃষ্টি করা হয়েছিল। শয়তান জিন জাতির অন্তর্গত, যাদেরকে আল্লাহ আগুন দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। তারা আদম সন্তানের মত পানাহার ও বংশ বিস্তার করে। তাদের কতক ঈমানদার ও কতক কাফের।[৪৫] শয়তানের বংশধর সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, أَفَتَتَّخِذُوْنَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَـاءَ مِنْ دُوْنِيْ وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِيْنَ بَـدَلاً- 'তোমরা কি আমার পরিবর্তে তাকে এবং তার বংশধরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করছ? অথচ তারা তোমাদের শত্রু। এটা যালিমদের জন্য খুবই নিকৃষ্ট বদল' *(কাহফ ১৮/৫০)*। জিনদের মধ্যে যারা কাফির, শয়তান তাদেরই অন্তর্ভুক্ত। আর তাদের প্রধান নেতা হ'ল মানব জাতির শত্রু ইবলীস।[৪৬]

শয়তান মানুষ, পশু-পাখি, এমনকি বন্য প্রাণীর আকৃতি ধারণ করতে পারে। যেমন কুরাইশদের নিকট বদর যুদ্ধের দিন সুরাকা বিন মালিকের আকৃতিতে এবং দারুন নদওয়ার বৈঠকে নাজদী শায়খের রূপ ধরে এসেছিল। শয়তান বাস্তবের ন্যায় স্বপ্নেও আসতে পারে এবং যে কোন রূপ ধারণ করতে পারে। তবে রাসূল (ছাঃ)-এর রূপ ধারণ করতে পারে না।[৪৭]

'শয়তান' শব্দের অর্থ- দুরাচারী, পাপাচারী ইত্যাদি। অধিকাংশ শয়তান পাপের স্থান, ময়লা-আবর্জনার জায়গা যেমন পায়খানা, গোসলখানায় অবস্থান করে। এ কারণে রাসূল (ছাঃ) এসব স্থানে ছালাত পড়তে নিষেধ করেছেন ও পায়খানায় প্রবেশ করতে নির্দিষ্ট দো'আ শিক্ষা দিয়েছেন।[৪৮] আর শয়তান শুধু জিনদের মধ্যে থেকে নয় বরং মানুষের মধ্যেও হয়ে থাকে। মানুষদের মধ্যে যারা অন্যায় কাজ করে, অন্যকে অন্যায়ের আদেশ দেয়, অন্যায় কাজে উৎসাহিত করে তারাই মানব শয়তান। এজন্যই কুরআনের সূরা নাসে জিন শয়তানের কাছ থেকে আশ্রয় গ্রহণের সাথে সাথে মানব শয়তান থেকেও আশ্রয়ের নির্দেশ এসেছে। হাসান বছরী (রহঃ) বলেন, 'শয়তান দু'প্রকার; জিন শয়তান সর্বদা মানুষের মনে ধোঁকা দেয়। আর মানুষ শয়তান প্রকাশ্যে ধোঁকা দেয়'।[৪৯] ক্বাতাদাহ বলেন, 'জিনের মধ্যেও শয়তান আছে, মানুষের মধ্যেও শয়তান আছে। তারা নিজ নিজ দলভুক্তদেরকে পাপকার্য শিক্ষা দেয়। তোমরা উভয় শয়তান থেকে আল্লাহ্র কাছে আশ্রয় চাও'। ইকরিমা (রহঃ) বলেন, 'মানবদের শয়তান হচ্ছে তারাই যারা মানুষকে পাপকার্যের পরামর্শ দেয়'।[৫০] একদা আবু যার গিফারী (রাঃ) জনৈক ব্যক্তিকে বলেন, তুমি কি মানুষ শয়তান থেকে আল্লাহ্র আশ্রয় চেয়েছ? লোকটি বলল, মানুষের শয়তান আছে কি? তিনি বললেন, হ্যাঁ আছে।

৪৫. *আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ ১ম খণ্ড, ১৪৪ পৃঃ।*
৪৬. *ঐ, পৃঃ ১৪৭।*
৪৭. *বুখারী 'ইলম' অধ্যায় হা/১১০; মুসলিম, মিশকাত হা/৪৬০৯।*
৪৮. *বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩৩৭; ইবনু মাজাহ হা/২৯৭।*
৪৯. *তাফসীরে কুরতুবী, সূরা নাস দ্রঃ।*
৫০. *তাফসীরে ইবনে কাছীর, সূরা আন'আমের ১১২ নং আয়াতের তাফসীর দ্রঃ।*

অতঃপর তিনি নিচের আয়াতটি পাঠ করলেন, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِيْنَ الإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوْحِيْ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُوْرًا– 'এমনিভাবে আমি প্রত্যেক নবীর জন্য শত্রু সৃষ্টি করেছি মানুষ শয়তান ও জিন শয়তানদের মধ্য থেকে। তারা ধোঁকা দেওয়ার জন্য একে অপরকে কারুকার্য খচিত কথাবার্তা শিক্ষা দেয়' *(আন'আম ৬/১১২)*।

মানুষের ন্যায় জিন জাতির উপরও আল্লাহ্র ইবাদত করা ফরয *(যারিয়াত ৫৬)*। তারাও ক্বিয়ামতের দিন জিজ্ঞাসিত হবে *(আন'আম ৬/১৩০)*। মুহাম্মাদ (ছাঃ) মানুষের ন্যায় জিনদের জন্যও রাসূল রূপে প্রেরিত হয়েছিলেন। সূরা জিনের শুরুতে ও সূরা আর-রহমানে জিনদেরকে আল্লাহ্র রাসূলের দাওয়াতের কথা বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা প্রতিটি জীবকে জোড়া জোড়া সৃষ্টি করেছেন। তাই শয়তান তথা জিনদেরও বিবাহ-শাদী হয়, ঘর-সংসার আছে এবং তাদেরও বংশ বৃদ্ধি হয় *(কাহফ ১৮/৫০)*। তাদের খাদ্য হচ্ছে হাড়। তা খাওয়ার সময় 'বিসমিল্লাহ' বললেই তা পূর্ণাঙ্গ গোশতে পরিণত হয়। আর গোবর হচ্ছে তাদের পশুর খাদ্য।[৫১] শয়তান মানুষের মধ্যে প্রবেশ করতে পারে, যেভাবে রক্তনালী প্রবাহিত হয়।[৫২]

মানুষকে পাপের পথে নেওয়ার জন্য বিভিন্ন শয়তান সব সময় প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। মানব শিশু জন্মের সাথে সাথেই শয়তান তাকে আঘাত করে। আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, مَا مِنْ مَوْلُوْدٍ يُوْلَدُ إِلاَّ وَالشَّيْطَانُ يَمَسُّهُ حِيْنَ يُوْلَدُ فَيَسْتَهِلُّ صَارِخًا مِنْ مَسِّ الشَّيْطَانِ إِيَّاهُ إِلاَّ مَرْيَمَ وَابْنَهَا– 'প্রত্যেক শিশু সন্তান জন্মগ্রহণ করার সময় শয়তান তাকে স্পর্শ করে। শয়তানের স্পর্শমাত্রই সে চিৎকার করে উঠে। কিন্তু মারিয়াম (আঃ) ও তাঁর পুত্র ঈসা (আঃ)-কে পারেনি'।[৫৩]

আর জন্মের সময়ে প্রত্যেকেই সত্য দ্বীনের উপর থাকে কিন্তু শয়তান তাকে সত্য দ্বীন থেকে বিচ্যুত করে। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, আল্লাহ বলেন, وَإِنِّيْ خَلَقْتُ عِبَادِيْ حُنَفَاءَ كُلَّهُمْ وَإِنَّهُمْ أَتَتْهُمُ الشَّيَاطِيْنُ فَاجْتَالَتْهُمْ عَنْ دِيْنِهِمْ– 'আমি আমার বান্দাদের 'হানীফ' (অর্থাৎ আল্লাহ্র প্রতি একনিষ্ঠ) রূপে সৃষ্টি করেছি। অতঃপর শয়তান তার পিছে লেগে তাদেরকে তাদের দ্বীন থেকে দূরে নিয়ে যায়'।[৫৪]

৫১. *মুসলিম হা/৪৫০ 'ছালাত' অধ্যায়; তিরমিযী হা/৩২৫৮।*
৫২. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৬৮; তিরমিযী হা/১১৭২।*
৫৩. *বুখারী, 'তাফসীর' অধ্যায় হা/ ৪১৮৯; মুসলিম, মিশকাত হা/৬৯।*
৫৪. *মুসলিম হা/২৮৬৫ 'জান্নাতের বিবরণ' অধ্যায়; আহমাদ হা/১৬৮৩৭।*

এমনিভাবে শয়তান প্রত্যেক মানুষকে জন্মের পর থেকে মৃত্যু পর্যন্ত এমনকি মৃত্যুর সময়ও ধোঁকা দিয়ে থাকে। তাই আল্লাহ দুনিয়াতে মানুষকে প্রেরণ করে আল্লাহ্র অনুসরণের নির্দেশ দেওয়ার সাথে সাথে শয়তানের পদাংক অনুসরণ থেকে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেন, وَلاَ تَتَّبِعُواْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ– 'তোমরা শয়তানের পদাংক অনুসরণ করো না, নিশ্চয়ই সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু' *(বাক্বারাহ ২/১৬৮, ২০৮; আন'আম ৬/১৪২)*। দুনিয়ার জীবন শেষে পরকালেও আল্লাহ শয়তানের অনুসরণ না করার প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবেন। তাই মানুষকে লক্ষ্য করে আল্লাহ্র ওয়াদা স্মরণ করিয়ে দিয়ে তাঁর ইবাদত করার নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ বলেন,

أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِيْ آدَمَ أَن لاَّ تَعْبُدُوْا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ، وَأَنِ اعْبُدُوْنِيْ هَذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ، وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلاًّ كَثِيْرًا أَفَلَمْ تَكُوْنُوْا تَعْقِلُوْنَ–

'হে বনী আদম! আমি কি তোমাদেরকে বলে রাখিনি যে, শয়তানের ইবাদত করো না, সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু এবং আমার ইবাদত কর। এটাই সরল পথ। শয়তান তোমাদের অনেক দলকে পথভ্রষ্ট করেছে। তবুও কি তোমরা বুঝ না?' *(ইয়াসীন ৩৬/৬০-৬২)*। শয়তান মানুষকে সব সময় জাহান্নামে নিতে চায়। তাই আমাদের উচিৎ শয়তান সম্পর্কে সচেতন থাকা ও একনিষ্ঠভাবে আল্লাহ্র অনুসরণ করা।

শয়তানের কাজসমূহ :

শয়তানের কাজ হ'ল মানুষকে খারাপ ও মন্দ কাজের প্রতি আহ্বান করা। পৃথিবীতে যত মন্দকাজ আছে সবগুলিই শয়তানের কাজ। নিম্নে কুরআন ও হাদীছের আলোকে শয়তানের কতিপয় কাজ উল্লেখ করা হ'ল।-

১. মানুষকে বিপথগামী করা : আদম (আঃ)-কে সিজদা না করার কারণে যখন শয়তানকে দুনিয়াতে নামিয়ে দেয়া হ'ল তখন সে মানুষকে বিপথগামী করার দৃপ্ত শপথ করে। কুরআনের ভাষায়, قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِيْنَ– 'সে (শয়তান) বলল, আপনার ইয্যতের কসম! আমি অবশ্যই তাদের সবাইকে বিপথগামী করে দেব' *(ছোয়াদ ৩৮/৮২)*। বিপথগামী করার মাধ্যমে শয়তান মানুষদেরকে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যায়। আল্লাহ বলেন, إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوْهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُو حِزْبَهُ لِيَكُوْنُوْا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيْرِ– 'শয়তান তোমাদের শত্রু। সুতরাং তাকে শত্রু হিসাবে গ্রহণ কর। সে তো তার দলবলকে আহ্বান করে

শুধু এজন্য যে, তারা যেন জাহান্নামী হয়' *(ফাতির ৩৫/৬)*। ইবনু মাসউদ (রাঃ) বলেন, আমাদের জন্য রাসূল (ছাঃ) একটা দাগ টানলেন, অতঃপর বললেন, 'এটা আল্লাহ তা'আলার সোজা ও সঠিক রাস্তা। অতঃপর তার ডানে ও বামে আরো কিছু দাগ টানলেন। তারপর বললেন, এগুলি অন্য রাস্তা, যাদের প্রত্যেকটার শুরুতে শয়তান বসে মানুষদেরকে তার দিকে ডাকছে। তারপর কুরআন থেকে পড়লেন 'অবশ্যই এর অনুসরণ করবে এবং অন্যান্য রাস্তাসমূহকে অনুসরণ কর না, তাহ'লে এ রাস্তাসমূহ তোমাদেরকে তাঁর রাস্তা থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলবে। আল্লাহ তা'আলা এভাবেই তোমাদেরকে উপদেশ দিচ্ছেন, যাতে তোমরা মুত্তাক্বী হ'তে পার'।[৫৫]

২. চক্রান্ত করাঃ শয়তান সব সময় মানুষের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করে থাকে। তার চক্রান্ত দুর্বল উল্লেখ করে আল্লাহ বলেন, فَقَاتِلُوْا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيْفًا– 'সুতরাং তোমরা জিহাদ করতে থাক শয়তানের পক্ষাবলম্বনকারীদের বিরুদ্ধে। নিশ্চয়ই শয়তানের চক্রান্ত একান্তই দুর্বল' *(নিসা ৪/৭৬)*।

৩. মানুষের মাঝে শত্রুতা-বিদ্বেষ সৃষ্টি করা ও ইবাদত থেকে বিরত রাখাঃ আল্লাহ বলেন,

إِنَّمَا يُرِيْدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوْقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَعَنِ الصَّلاَةِ فَهَلْ أَنْتُم مُّنتَهُوْنَ–

'শয়তান তো চায়, মদ ও জুয়ার মাধ্যমে তোমাদের পরস্পরের মাঝে শত্রুতা ও বিদ্বেষ সঞ্চারিত করে দিতে এবং আল্লাহ্র স্মরণ ও ছালাত থেকে তোমাদের বিরত রাখতে। অতএব তোমরা নিবৃত্ত হবে কি?' *(মায়েদা ৫/৯১)*। জাবির (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি 'আরব উপদ্বীপের মুসলমানদের কাছ থেকে শয়তান আনুগত্য পাওয়ার ব্যাপারে নিরাশ হয়ে গেছে। কিন্তু তাদের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ, মনোমালিন্য ও পারস্পরিক সম্পর্ক ছিন্ন করার ব্যাপারে সে নিরাশ হয়নি'।[৫৬]

৪. আল্লাহ্র বান্দাদের মাঝে ঝগড়া সৃষ্টি করাঃ আল্লাহ বলেন, وَقُل لِّعِبَادِيْ يَقُوْلُوا الَّتِيْ هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلإِنْسَانِ عَدُوًّا مُّبِيْنًا– 'আমার বান্দাদেরকে বলে দিন, তারা যেন যা উত্তম এমন কথাই বলে। শয়তান তাদের মধ্যে সংঘর্ষ বাধায়। নিশ্চয়ই শয়তান মানুষের প্রকাশ্য শত্রু' *(বনী ইসরাঈল ১৭/৫৩)*।

জাবির (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'শয়তান তার সিংহাসনকে পানির উপর স্থাপন করে। তারপর মানব সমাজে তার বাহিনীসমূহ প্রেরণ করে। তার দৃষ্টিতে ফেৎনা সৃষ্টি করায় যে যত বড়, মর্যাদায় সে তত বেশী নৈকট্যের অধিকারী। তাদের কেউ একজন আসে আর বলে যে, আমি অমুকের পেছনে লেগেই থাকি। অবশেষে তাকে এমন অবস্থায় রেখে এসেছি যে, সে এমন এমন জঘন্য কথা বলে বেড়াচ্ছে। একথা শুনে ইবলীস বলে, না, আল্লাহ্র শপথ! তুমি কিছুই করনি। আবার আরেকজন এসে বলে, আমি অমুক ও তার স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিয়েই তবে ছেড়েছি। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, একথা শুনে শয়তান তাকে কাছে টেনে নেয় এবং বলে, কত উত্তম কাজই না তুমি করেছো!'[৫৭]

৫. প্ররোচিত করাঃ শয়তান মানুষকে খারাপ কাজের দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য বিভিন্নভাবে প্ররোচনা দিয়ে থাকে। সে সর্বপ্রথম প্ররোচনা দিয়েছিল আদম (আঃ) ও তাঁর স্ত্রী হাওয়া (আঃ)-কে। আল্লাহ বলেন,

فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِن سَوْءَاتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَـذِهِ الشَّجَرَةِ إِلاَّ أَنْ تَكُوْنَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُوْنَا مِنَ الْخَالِدِيْنَ–

'অতঃপর শয়তান উভয়কে প্ররোচিত করল, যাতে তাদের অঙ্গ, যা তাদের কাছে গোপন ছিল, তাদের সামনে প্রকাশ করে দেয়। সে বলল, তোমাদের পালনকর্তা তোমাদেরকে এ বৃক্ষ থেকে নিষেধ করেননি; তবে তা এ কারণে যে, তোমরা না আবার ফেরেশতা হয়ে যাও কিংবা হয়ে যাও চিরকাল বসবাসকারী' *(আ'রাফ ৭/২০)*। অন্যত্র আল্লাহ বলেন, فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَّا يَبْلَى– 'অতঃপর শয়তান তাকে প্ররোচনা দিল, বলল, হে আদম! আমি কি তোমাকে বলে দেব অনন্তকাল জীবিত থাকার বৃক্ষের কথা এবং অবিনশ্বর রাজত্বের কথা' *(ত্বোয়া-হা ২০/১২০)*।

৬. পাপ কাজকে সুশোভিত করাঃ শয়তান পাপ কাজকে সুশোভিত করে যাতে মানুষ সে দিকে আকৃষ্ট হয়। আল্লাহ বলেন, وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوْبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ– 'বস্তুতঃ তাদের অন্তর কঠোর হয়ে গেল এবং শয়তান তাদের কাছে সুশোভিত করে দেখাল, যে

৫৫. *আহমাদ, নাসাঈ, হাকেম, তাফসীরে ইবনে কাছীর, সূরা আন'আমের ১৫৩ নং আয়াতের তাফসীর দ্রঃ। পৃঃ ৩/৩৬৬, মিশকাত হা/১৬৬, সনদ হাসান।*

৫৬. *মুসলিম হা/২৮১২; রিয়াযুছ ছালেহীন হা/১৫৯৪।*

৫৭. *মুসলিম হা/২৮১৩; মিশকাত 'ঈমান' অধ্যায়, হা/৭১।*

কাজ তারা করছিল' *(আন'আম ৬/৪৩)*। হুদহুদ পাখি সুলায়মান (আঃ)-কে রাণী বিলকীসের জাতির বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছিল,

وَجَدتُّهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُوْنَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُوْنِ اللهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيْلِ فَهُمْ لاَ يَهْتَدُوْنَ-

'আমি তাকে ও তার সম্প্রদায়কে দেখলাম তারা আল্লাহ্র পরিবর্তে সূর্যকে সিজদা করছে। শয়তান তাদের দৃষ্টিতে তাদের কার্যাবলী সুশোভিত করে দিয়েছে। অতঃপর তাদেরকে সৎপথ থেকে নিবৃত্ত করেছে। অতঃপর তারা সৎ পথ পায় না' *(নামল ২৭/২৪)*। সূরা আনকাবূতের ৩৮ নং আয়াতেও এ বিষয়ে আলোচনা এসেছে।

৭. কৃত ওয়াদা বা অঙ্গীকার ভঙ্গ করাঃ শয়তান মানুষের সাথে ওয়াদা করে যে, সে খারাপ কাজ করলে মানুষদেরকে সাহায্য করবে; পরে সে ওয়াদা ভঙ্গ করে। আল্লাহ বলেন, يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيْهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلاَّ غُرُوْرًا- 'সে তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দেয় এবং তাদেরকে আশ্বাস দেয়। শয়তান তাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দেয়, তা সব প্রতারণা বৈ কিছু নয়' *(নিসা ৪/১২০)*। এছাড়া যাকাত দিলে ফকীর হয়ে যাবে এ ধরনের ধোঁকা শয়তান মানুষকে দিয়ে থাকে। আল্লাহ বলেন, الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاء وَاللهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلاً وَاللهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ- 'শয়তান তোমাদেরকে অভাব-অনটনের ওয়াদা (ভীতি প্রদর্শন) করে এবং অশ্লীলতার আদেশ দেয়। পক্ষান্তরে আল্লাহ তা'আলা নিজের পক্ষ থেকে ক্ষমা ও বেশী অনুগ্রহের ওয়াদা করেন। আল্লাহ প্রাচুর্যময়, সুবিজ্ঞ' *(বাক্বারাহ ২/২৬৮)*। ক্বিয়ামতের দিন যারা শয়তানের ওয়াদা অনুযায়ী চলেছে তারা যখন দেখবে যে তারা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারে না তখন তারা শয়তানকে দোষারোপ করবে। এর জবাবে শয়তান বলবে, وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الأَمْرُ إِنَّ اللهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدتُّكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ- 'যখন সব কিছুর মীমাংসা হয়ে যাবে তখন শয়তান বলবে, আল্লাহ তোমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন সত্য প্রতিশ্রুতি, আমিও তোমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম, কিন্তু আমি তোমাদেরকে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিনি' *(ইবরাহীম ১৪/২২)*।

৮. প্রতারণা করাঃ শয়তান মানুষকে যে ওয়াদা দেয় সে ওয়াদা আসলে ওয়াদা নয় বরং প্রতারণা মাত্র। আদমকে সিজদা না করার ঘটনায় আল্লাহ শয়তানের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلاَّ غُرُوْرًا- 'প্রতারণা ছাড়া শয়তান কোন ওয়াদা দেয় না' *(বনী ইসরাঈল ১৭/৬৪)*। অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন, 'এমনিভাবে আমি প্রত্যেক নবীর জন্য শত্রু করেছি শয়তান, মানব ও জিনকে। তারা প্রতারণা করার জন্য একে অপরকে কারুকার্যখচিত কথাবার্তা শিক্ষা দেয়। যদি আপনার পালনকর্তা চাইতেন, তবে তারা এ কাজ করত না' *(আন'আম ৬/১১২)*।

৯. খারাপ ও অশ্লীল কাজের আদেশ দেয়া : আল্লাহ বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لاَ تَتَّبِعُوْا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ-

'হে ঈমানদারগণ! তোমরা শয়তানের পদাংক অনুসরণ করো না। যে কেউ শয়তানের পদাংক অনুসরণ করবে, তখন তো শয়তান নির্লজ্জতা ও মন্দ কাজেরই আদেশ করবে' *(নূর ২৪/২১)*।

১০. মুসলমানদেরকে বিভক্ত করাঃ হাদীছে কুদসীতে এসেছে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, আল্লাহ বলেন, وَإِنِّيْ خَلَقْتُ عِبَادِيْ حُنَفَاءَ كُلَّهُمْ وَإِنَّهُمْ أَتَتْهُمُ الشَّيَاطِيْنُ فَاجْتَالَتْهُمْ عَنْ دِينِهِمْ وَحَرَّمَتْ عَلَيْهِمْ مَا أَحْلَلْتُ لَهُمْ- 'বান্দাদেরকে আমি আমার প্রতি একাগ্রচিত্ত (তাওহীদমুখী) করে সৃষ্টি করেছি। অতঃপর শয়তান তাদেরকে বিভ্রান্ত করে দিয়েছে। ফলে আমি তাদের জন্য যা হালাল করেছিলাম তা হারাম করে দিয়েছে'।[৫৮]

ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, শয়তানের চক্রান্তের মধ্যে অন্যতম চক্রান্ত হচ্ছে, সাধারণ মানুষকে একই ঢং-এর একই পোষাক পরিধান, নির্দিষ্ট চাল-চলন অবলম্বন, নির্দিষ্ট পীর-মুরশিদ গ্রহণ, নবাবিষ্কৃত তরীকা ও নির্দিষ্ট একটি মাযহাব গ্রহণের আদেশ দেয়া এবং ঐ গুলিকে আঁকড়ে ধরা এমনভাবে তাদের উপর আবশ্যিক করে দেয়, যেমন তারা ফরয কার্যাবলী আকঁড়ে ধরে থাকে। যে ব্যক্তি তাদের ঐ সব কাজ করে না তাকে তারা দোষারোপ করে এবং নিন্দা করে। নির্দিষ্ট মাযহাব সমূহের অধিকাংশ মুক্বাল্লিদ ও ভ্রান্ত আক্বীদাবলম্বী ছূফীদের বিভিন্ন তরীকার মুরীদরা এ ধরনের আচরণ করে থাকে। যেমন- নকশাবন্দিয়াহ, ক্বাদরিয়াহ, সহরওয়ারদিয়াহ, শাযলিয়াহ তাজানিয়াহ প্রভৃতি দলের অনুসারীরা। তারা শরী'আত ও হাকীকত নামের বিভিন্ন আনুষ্ঠানিকতা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। ফলে তারা যাবতীয় বিদ'আতী রসম-রেওয়াজে নিমজ্জিত হয়েছে। রাসূল (ছাঃ)-এর তরীকা ও এদের তরীকার মধ্যে ব্যাপক ব্যবধান রয়েছে।[৫৯]

---

৫৮. *মুসলিম 'জান্নাতের বিবরণ' অনুচ্ছেদ হা/২৮৬৫; মিরকাত, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৭৫, টীকা নং ৯০; তাফসীর ইবনে কাছীর, ১১তম খণ্ড, পৃঃ ২৬।*

৫৯. *মুহাম্মদ সুলতান আল-মা'ছুমী আল-খাজান্দী আল-মাক্কী, মুসলিম কি চার মাযহাবের নির্দিষ্ট এক মাযহাব অনুসরণ করতে বাধ্য, অনুবাদ: আবু তাহের (সিরাজগঞ্জ: রুকাইয়া প্রকাশনী, ১ম প্রকাশ, ২০০০), পৃঃ ৬৩।*

১১. মুমিনদের সাথে তর্কের জন্য শয়তান তার অনুসারীদের পরামর্শ দেয় : আল্লাহ বলেন, إِنَّ الشَّيَاطِيْنَ لَيُوْحُوْنَ إِلَى أَوْلِيَآئِهِمْ لِيُجَادِلُوْكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوْهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُوْنَ– 'নিশ্চয়ই শয়তানরা তাদের বন্ধুদেরকে প্রত্যাদেশ করে যেন তারা তোমাদের সাথে তর্ক করে। যদি তোমরা তাদের অনুগত্য কর, তোমরাও মুশরিক হয়ে যাবে' *(আন'আম ৬/১২১)*।

১২. অপচয় ও অপব্যয় করা: অপচয় ও অপব্যয় শয়তানের কাজ। আল্লাহ বলেন, إِنَّ الْمُبَذِّرِيْنَ كَانُوْا إِخْوَانَ الشَّيَاطِيْنِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُوْرًا– 'নিশ্চয়ই অপব্যয়কারীরা শয়তানের ভাই। শয়তান স্বীয় পালনকর্তার প্রতি অতিশয় অকৃতজ্ঞ' *(বনী ইসরাঈল ১৭/২৭)*।

১৩. ধোঁকা দেওয়া: আল্লাহ শয়তানের কাজ সম্পর্কে বলেন, وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنْسَانِ خَذُوْلاً– 'শয়তান মানুষকে বিপদকালে ধোঁকা দেয়' *(ফুরক্বান ২৫/২৯)*।

১৪. ভাল কাজে বাধা ও মন্দ কাজে উৎসাহ দান: আল্লাহ মুমিনদেরকে সতর্ক করে বলেন, وَلاَ يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ– 'শয়তান যেন তোমাদেরকে (ভাল কাজ করা থেকে) বাধা না দেয়। নিশ্চয়ই সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু' *(যুখরুফ ৪৩/৬২)*। শয়তান ভাল কাজে বাধা দেওয়ার সাথে সাথে মন্দ কাজে উৎসাহিত করে। আল্লাহ বলেন, أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِيْنَ عَلَى الْكَافِرِيْنَ تَؤُزُّهُمْ أَزًّا– 'আপনি কি লক্ষ্য করেননি যে, আমি কাফেরদের উপর শয়তানকে ছেড়ে দিয়েছি। তারা তাদেরকে বিশেষভাবে (মন্দকার্যে) উৎসাহিত করে' *(মারিয়াম ১৯/৮৩)*।

১৫. প্রভুত্ব বিস্তার করা ও আল্লাহ্র স্মরণ থেকে ভুলিয়ে দেওয়া: আল্লাহ বলেন, اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَأَنْسَاهُمْ ذِكْرَ اللهِ أُوْلَئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ أَلاَ إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ الْخَاسِرُوْنَ– 'শয়তান তাদের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করেছে, ফলে তাদেরকে ভুলিয়ে দিয়েছে আল্লাহ্র স্মরণ। তারা শয়তানেরই দল। সাবধান! শয়তানের দল অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত' *(মুজাদালা ৫৮/১৯)*।

১৬. যাদু করা: আল্লাহ সুলায়মান (আঃ)-এর সময়ের অবস্থা বর্ণনা করে বলেন, وَاتَّبَعُوْا مَا تَتْلُوْا الشَّيَاطِيْنُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِيْنَ كَفَرُوْا يُعَلِّمُوْنَ النَّاسَ السِّحْرَ– 'তারা ঐ শাস্ত্রের অনুসরণ করল, যা মুসলমানদের রাজত্বকালে শয়তানেরা আবৃত্তি করত। সুলায়মান কুফরী করেনি; শয়তানরাই কুফরী করেছিল। তারা মানুষকে যাদুবিদ্যা শিক্ষা দিত' *(বাক্বারাহ ২/১০২)*। জাবের বিন আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ)-কে যাদু দ্বারা যাদু ছুটানো সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হ'লে তিনি বলেন, 'এটি শয়তানের কাজ'।[৬০]

১৭. বিভ্রান্ত করা: ওহোদ যুদ্ধে মুসলমানদের অবস্থা বর্ণনা করে আল্লাহ বলেন, إِنَّ الَّذِيْنَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوْا– 'তোমাদের যে দু'টি দল লড়াইয়ের দিনে ঘুরে দাঁড়িয়েছিল শয়তান তাদেরকে বিভ্রান্ত করেছিল, তাদেরই পাপের দরুন' *(আলে ইমরান ৩/১৫৫)*।

১৮. নিজের ইবাদত করানো: হাশরের দিনে জাহান্নামীদের বলবেন, أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَن لاَّ تَعْبُدُوْا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ– 'হে বনী আদম! আমি কি তোমাদেরকে বলে রাখিনি যে, শয়তানের ইবাদত করো না, সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু' *(ইয়াসীন ৩৬/৬০)*।

১৯. মদ, জুয়া ও শিরকের প্রচলন করা: আল্লাহ বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ–

'হে মুমিনগণ! মদ, জুয়া, প্রতিমা এবং ভাগ্য-নির্ধারক শরসমূহ এসব শয়তানের অপবিত্র কাজ বৈ তো নয়। অতএব এগুলো থেকে বেঁচে থাক, যাতে তোমরা কল্যাণপ্রাপ্ত হও' *(মায়েদা ৫/৯০)*।

২০. কুফরীতে নিমজ্জিত করা: আল্লাহ বলেন,

كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنْسَانِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّيْ بَرِيْءٌ مِّنْكَ إِنِّيْ أَخَافُ اللهَ رَبَّ الْعَالَمِيْنَ–

'তাদের দৃষ্টান্ত শয়তানের মত, যে মানুষকে বলে, কুফরী কর। অতঃপর যখন সে কুফরী করে তখন শয়তান বলে, তোমার সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই, আমি জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহকে ভয় করি' *(হাশর ৫৯/১৬)*।

[চলবে]

---

৬০. *আহমাদ হা/১৪১৬৭, ৩/২৯৪; আবু দাউদ হা/৩৮৬৮; মিশকাত হা/৪৫৫৩, সনদ ছহীহ।*

ধর্মদ্রোহিতা

*মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান**

'আশরাফুল মাখলূকাত' এই বাক্যাংশটি ইসলামী পরিভাষা তথা আরবী ভাষার শব্দ বিধায় উচ্চারণ-নিষিদ্ধ নামের মতো যারা মনে করেন, তারাও 'মানুষ সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব' কথাটা অস্বীকার করেন না। মানুষ কেন শ্রেষ্ঠ জীব, তাদের শিং এবং চারটি পা নেই বলে? অবশ্য তা নয়। মানুষ শ্রেষ্ঠ জীব তার বুদ্ধি, বিবেক ও ধর্ম থাকার কারণেই। এগুলি না থাকলে সে পশুতুল্য শুধুই নয়, কখনও কখনও পশুরও অধম বিবেচিত হয়।

ডারউইনবাদী এবং স্বয়ম্ভুবাদীরা সৃষ্টিকর্তায় বিশ্বাসী নয়; তারা নাস্তিক। নাস্তিক যদিও না হয়, ডারউইনবাদ পড়ে অন্তত সংশয়বাদী হবেই। নাস্তিক এবং সংশয়বাদীর মধ্যে খুব একটা পার্থক্য নেই। কেননা নাস্তিক বিশ্বাস বর্জনকারী এবং সংশয়বাদী বিশ্বাস-অবিশ্বাসের মধ্যে দিশেহারা অবস্থায় হাবুডুবু খায়। আসলে উভয়েরই পরিণাম এক রকমের। প্রকৃতপক্ষে তারা কেউই স্রষ্টার প্রতি বিশ্বাসী নয়।

বুদ্ধি মানুষকে কর্মকুশলতা শেখায়। বিবেক ভাল-মন্দ যাচাই-বাছাই করার ক্ষমতা যোগায়। আর ধর্ম মানুষকে পাপ ও পতন থেকে রক্ষা করে। পণ্ডিতেরা বলেন, 'ধৃ' ধাতু থেকে 'ধর্ম' শব্দের উৎপত্তি। 'ধৃ' অর্থ ধারণ বা ধরে রাখা। বিশ্লেষণে বলা যেতে পারে যে, কতকগুলি সৎবিধি অনুসরণ করে চলা মানুষের কর্তব্য। আর তা-ই মানুষের ধর্ম। পশুদের জন্য সেরূপ কোন বিধি-বিধান নেই। কেননা তাদের বুদ্ধি-বিবেকও মানুষের মতো নেই বলেই তারা ধর্মাচরণের অযোগ্য। এ কারণেও মানুষ শ্রেষ্ঠ জীব।

সত্যিকারের ধার্মিক লোকেরা বিশ্বাস করে যে, মানুষকে ধর্ম বিধিও দিয়েছেন স্বয়ং সৃষ্টিকর্তা। এটা কোন মানবরচিত বিধান নয়। Evolution Theory (ইভোলিউশন থিওরী) বা বিবর্তনবাদ চার্লস ডারউইন নামের একজন বিজ্ঞানীর ব্যক্তিগত চিন্তার ফসল, 'গ্রন্থ সাহেব' পাঞ্জাবের গুরু নানকের বাণী, ত্রিপিটক নেপালের (কপিলাবস্তু) বুদ্ধদেবের (সিদ্ধার্থ) উপদেশমালা- এ সকলই সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টজীব মানুষেরই উর্বর মস্তিষ্কের চিন্তার ফসল। এ ধরনের বহু কিছু মানুষের মস্তিষ্কে আসতে পারে। তাই বলে মানুষকে কখনও স্বয়ম্ভু বলা যাবে না। মানুষ স্রষ্টার সৃষ্টজীব। সকল মানুষকে সৃষ্টিকর্তার দেওয়া বিধান অনুসরণ করেই চলতে হবে। আর তাকেই বলে ধর্ম পালন। আর তা সঠিকভাবে পালন করলেই পাপ ও পতন থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।

প্রশ্ন হচ্ছে- ৯০% মুসলমানের দেশকে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র করতে হবে কেন? ধর্ম কি ক্ষতি করেছে এ দেশটার? ধর্মের কারণে এ দেশের মানুষের কোন্ অকল্যাণ ঘটেছে যে, দেশটাকে ধর্মনিরপেক্ষ না করলে আর চলে না? এটা কি সেই মেষশাবক আর নেকড়ের গল্পের মতো ঘটনা? মেষশাবকের শেষ প্রশ্ন : আমাকে খাবে কেন? কি দোষ করেছি আমি? নেকড়ের উত্তর : দোষের কোন কথা নয়। তোকে খাবই। বাংলাদেশে ধর্মনিরপেক্ষতার আমদানী কি সে রকমের ব্যাপার? প্রসঙ্গতঃ বলতে হয়, বাংলাদেশে '৭০-এর নির্বাচনের পর একদল দ্বীনদার মুসলমান আশংকা করেছিলেন যে, আওয়ামী লীগ সরকার গঠন করতে পারলে দেশে ইসলাম থাকবে না। বর্তমান ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ সরকারের সংবিধান থেকে ইসলামী ভাবধারার বিষয়াবলী বর্জনের ঘোষণা, কুরআন বিরোধী নারী উন্নয়ণ নীতি প্রচলনের সিদ্ধান্ত, মাদরাসা শিক্ষায় ইসলামী বিষয়ের সংকোচন ইত্যাদি কিসের আলামত?

বাংলাদেশের লোকসংখ্যা যদি ষোল কোটি হয়, তবে তার মধ্যে প্রায় পনের কোটিই মুসলমান, যাদের ধর্ম ইসলাম এবং বাকী দেড় কোটির মধ্যে রয়েছে তিন ধর্মের মানুষ, যথা- হিন্দু, বৌদ্ধ ও খৃষ্টান। দেশের সংবিধানের শীর্ষে 'বিসমিল্লা-হির রহমানির রহীম' যে বাক্যটি প্রায় ১৫ কোটি লোকের ধর্ম বিধিমতে শোভা পাচ্ছে, তা তাদের সকল কাজের শুরুতে থাকা অপরিহার্য। কুরআন মাজীদের প্রতিটি সূরার প্রারম্ভে লেখা রয়েছে 'বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম'। মুসলমান তাই প্রতি কাজের শুরুতে এটি বলে থাকেন। এ নিয়ম মুসলমানের কাছে অলংঘনীয়। হালাল পশুও 'বিসমিল্লাহ' বলে যবেহ না করলে সেই গোশত মুসলমানের জন্য হালাল নয়।

বাংলাদেশে ৭২ সালে রাষ্ট্রীয় মূলনীতি হিসাবে ধর্মনিরপেক্ষতা কেন গ্রহণ করা হয়েছিল? মনে হয়, দেশে ধর্মনিরপেক্ষ মানুষ কোন কালেই সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল না। তা যদি প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারতের অনুসরণে হয়, তাহ'লে বলতে হবে যে, ভারতের ধর্মনিরপেক্ষ নীতি তাদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অধিবাসীর হিন্দু ধর্মকে পাশ কাটিয়ে হয়নি, যেমন বাংলাদেশের ধর্মনিরপেক্ষতা সংখ্যাগরিষ্ঠের ধর্ম ইসলামকে পাশ কাটিয়ে হচ্ছে। ভারতে হিন্দু ধর্মের কোন সংকোচন হয়েছে বলে শোনা যায় না। সেখানে ধর্মভিত্তিক দল গঠন নিষিদ্ধ করা হয়নি। কিংবা ধর্মশিক্ষাকে সংকুচিত করার চেষ্টাও নেই। যদি তা থাকত তাহ'লে নিশ্চয়ই তা নিয়ে আন্দোলন হতো। কিন্তু সে রকম খবর পাওয়া যায় না।

বাংলাদেশের ধর্মপ্রাণ মুসলমানেরও 'বাঙালী' বলে পরিচয় দিতে অসুবিধার কারণ নেই। তবে বাঙালী সংস্কৃতিকে তারা মেনে নেবেন না কিছুতেই, যেহেতু বাঙালী সংস্কৃতি হিসাবে যা চলছে তা ইসলাম ধর্মবিরোধী। দেখা যাচ্ছে, আমাদের দেশে এক দল লোক বর্ষবরণ, বসন্তবরণ এবং এরূপ আরো কিছু কিছু অনুষ্ঠান পালন করে, বাঙালী সংস্কৃতির নামে। যেগুলি হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত, হয়তো

* সম্পাদক, কালান্তর, রাজাবাড়ী, পিরোজপুর।

তাদের ধর্মীয় অনুশাসনও সমর্থন করে। কিন্তু ইসলামে সে সকল বিষয় নিষিদ্ধ। এইসব ইসলাম বিরোধী সংস্কৃতির চর্চা অবাধে চলতে পারে যদি রাষ্ট্রের সংবিধানে ধর্মনিরপেক্ষতা এবং বাঙালী জাতীয়তাবাদ বহাল থাকে। এজন্যই কি ৭২-এর সংবিধানে ফিরে যাবার প্রতি কিছু লোকের এত আগ্রহ? ইতিহাস বলে, দূর অতীতে এদেশ ছিল হিন্দুদের দেশ। গোটা ভারতবর্ষই ছিল হিন্দুর দেশ। কালক্রমে এদেশে মুসলমানের আগমন ঘটে। আর মুসলমানেরা তাদের ধর্ম ইসলাম অনুসরণ করেই জীবন যাপন করেছে। আজও মুসলমানকে তাদের ধর্মীয় স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করেই চলতে হবে। বর্তমান বাংলাদেশে ৯০% মুসলমানের বসবাস। সেকারণ এদেশকে মুসলমানের দেশ বলা যেতে পারে। তাই বলে এদেশে অন্যান্য ধর্মের লোকের বসবাসে কোন অসুবিধার কারণও নেই। তাহ'লে ধর্মনিরপেক্ষতা ও বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদ প্রতিষ্ঠা করতে চাচ্ছে কি ধর্ম থেকে সরে দাঁড়ানোর জন্য? যদি তা হয়, তবে তা হবে ধর্মদ্রোহিতা।

সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ কুরআন পাকে ঘোষণা করেন, 'তোমাদেরকে যা (কিতাব) দিয়েছি তা শক্ত করে ধর এবং তাতে যা আছে মনে রাখ, যাতে তোমরা মুত্তাক্বী হ'তে পার' *(বাক্বারাহ ৬৩)*। কুরআন মাজীদে আরও বলা হয়েছে, 'হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা পরিপূর্ণভাবে ইসলামে প্রবেশ কর এবং শয়তানের অনুসরণ কর না। নিশ্চয়ই সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু' *(বাক্বারাহ ২০৮)*। অতএব দ্বীনদার মুসলমান কখনও ধর্মনিরপেক্ষ হ'তে পারে না। ধর্ম তাদের রক্ষাকবচ। তাই ধর্মের মধ্যেই তাদের কল্যাণ নিহিত। তারা বাঙালী সংস্কৃতির নামে বিজাতীয় আচার-অনুষ্ঠান সমর্থন বা পালন করতে পারে না। তা থেকে তাদের দূরত্ব বজায় রেখে চলতে হবে। কুরআন মাজীদে আল্লাহ যে সকল বিধান দিয়েছেন, তা তাদের কাছে অলংঘনীয়। তাই ধর্মনিরপেক্ষতা, নারী অধিকার, নারীর পর্দাহীনতা, বেগানা নারী-পুরুষের সহাবস্থান, অবাধ মেলামেশা যা কুরআনে নিষিদ্ধ রয়েছে, তা অমান্য করলে আল্লাহ এবং তাঁর কিতাবকে অস্বীকার করা হয়। আর এতে আল্লাহ এবং তাঁর কিতাবের প্রতি বিশ্বাস থাকে না। ইসলাম যে পাঁচটি মূল ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত তার প্রথম ভিত্তি হ'ল ঈমান (বিশ্বাস)। এটি হারালে অন্যগুলি মেনে চলার মানে হয় না। বিসমিল্লাহ-এ গলদ ঘটলে, সবই গলদপূর্ণ হয়ে যায়। মুসলমান বলে পরিচয় দিতে হ'লে আল্লাহ এবং তাঁর কিতাবের ও কিতাব বর্ণিত যাবতীয় বিষয়ের প্রতি মজবুত ঈমান থাকা প্রয়োজন। ধর্মপ্রাণ মুসলমান অবশ্যই আল্লাহ্র সংবিধান মেনে চলবে। এ সংবিধানের সংগে সাংঘর্ষিক কোন কার্যকলাপে দ্বীনদার মুসলমান থাকতে পারে না। আল্লাহ আমাদের সবাইকে এই সত্য উপলব্ধির তাওফীক্ব দিন- আমীন!!

আল-ইখলাছ হজ্জ কাফেলা

আপনি কি ছহীহ পদ্ধতিতে হজ্জ করতে আগ্রহী? আজই যোগাযোগ করুন!

আমাদের বৈশিষ্ট্য সমূহঃ

* ছহীহ হাদীছ মোতাবেক হজ্জ পালনে সার্বক্ষণিক সহযোগিতা দান।
* বায়তুল্লাহ্র নিকটবর্তী বাড়ী ভাড়া।
* নিজস্ব বাবুর্চী দ্বারা নাশ্তা সহ তিন বেলা রুচি সম্মত বাঙ্গালী খাবার পরিবেশন।
* নিজ হাতে কুরবানীর পশু ক্রয় ও জবেহ করার সুব্যবস্থা।
* জাবালে নূর, জাবালে ছাওর, ওহোদ, খন্দক সহ মক্কা ও মদীনার ঐতিহাসিক স্থান সমূহ সফর।
* বিভিন্ন প্রকার বিদ'আত পরিহার করে হজ্জ ও ওমরার কার্যাদি রাসূলের তরীকা অনুযায়ী সম্পাদন করা।

পরিচালনায়	সার্বিক ব্যবস্থাপনায়	রাজশাহী অঞ্চলে যোগাযোগ	নারায়ণগঞ্জ
আলহাজ্জ মাওলানা আব্দুল মান্নান আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ সাতক্ষীরা সাংগঠনিক যেলা ০১৭১১-৩৬৫৩৩৭; ০১৯২০৫৮৭১৮৫।	ডি.বি.এইচ, ইন্টারন্যাশনাল ভি,আই,পি টাওয়ার (৭ম তলা) ৫১/১ ভি,আই,পি, রোড নয়াপল্টন, ঢাকা-১০০০। (০২) ৮৩৬১৩৬১; ৯৩৪৭০৪৩; ৯৩৫৪৫১০	মোফাক্ষার হোসাইন সহকারী শিক্ষক, আল-মারকাযুল ইসলাম আস-সালাফী নওদাপাড়া, রাজশাহী। ০১৭১১-৫৭৮০৫৭ আলহাজ্জ আমীনুল ইসলাম ০১৭৫৫-৫১৮১২৩	মাওলানা রবীউল ইসলাম খত্বীব, কাঞ্চন চৌধুরী পাড়া জামে মসজিদ, নারায়ণগঞ্জ ০১৮১৮-৭৭৭৭৪১

মাওলানা অহীদুয্যামান লক্ষ্মৌভী : তাক্বলীদের বন্ধন ছিন্নকারী খ্যাতিমান মুহাদ্দিছ

-নূরুল ইসলাম*

ভূমিকা :

'শায়খুল কুল ফিল কুল' মিয়াঁ নাযীর হুসাইন দেহলভীর (১৮০৫-১৯০২ খৃঃ) প্রায় সোয়া লক্ষ ছাত্রের মাঝে যারা নিজেদের ইলমী আভা বিকিরণে সদা তৎপর ছিলেন এবং গ্রন্থ রচনা ও হাদীছ শাস্ত্রের প্রচার-প্রসারে নিশিদিন অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করেছেন মাওলানা অহীদুয্যামান ছিলেন তাঁদের অন্যতম। ইমাম মুহাম্মাদ বিন সঊদ বিশ্ববিদ্যালয়ের (রিয়াদ, সঊদী আরব) শিক্ষক ড. আব্দুর রহমান ফিরিওয়াঈ বলেন,

من مشاهير الهند وكبار تلامذة السيد نذير حسين. قضى حياته فى نشر السنة النبوية، وله منة عظيمة على أهل الهند حيث قام بترجمة وشرح كتب السنة إلى الأردية.

'তিনি ভারতের প্রখ্যাত আলেম এবং সাইয়িদ নাযীর হুসাইনের বড় মাপের ছাত্রদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। হাদীছের প্রসারে তিনি তাঁর জীবন ব্যয় করেছেন। ভারতবাসীর ওপর তাঁর বড় অবদান রয়েছে। তিনি উর্দূতে হাদীছের গ্রন্থাবলী অনুবাদ ও ব্যাখ্যা করেন'।

জীবনের প্রথমদিকে তিনি কট্টর হানাফী ছিলেন। কিন্তু কালপরিক্রমায় ছহীহ হাদীছের উজ্জ্বল কিরণমালা মাওলানার আচরিত তাক্বলীদের অন্ধ প্রকোষ্ঠকে আলোকোজ্জ্বল করে তুললে তাঁর বিবেকের বন্ধ দুয়ার খুলে যায়। এক সময় তিনি আহলেহাদীছ হয়ে যান। হানাফী থাকা অবস্থায় হানাফী মাযহাবের সমর্থনে 'নূরুল হেদায়া' লিখলেও আহলেহাদীছ হওয়ার পর হেদায়ার কুরআন ও ছহীহ হাদীছ বিরোধী মাসআলাগুলোকে জনসম্মুখে উন্মীলন করেন তাঁর 'তানক্বীদুল হেদায়াহ ওয়া তাসদীদুর রিওয়াহ ওয়া ইছলাহুল হেদায়া' নামক বিখ্যাত গ্রন্থে। কুতুবে সিত্তাহ্র উর্দূ অনুবাদ করে তিনি হাদীছ শাস্ত্রের দিগ্বলয়ে দীপ্ত রবির ন্যায় চিরভাস্বর হয়ে আছেন।

জন্ম ও বংশ পরিচিতি :

মাওলানা অহীদুয্যামান ১৭ রজব ১২৬৭ হিজরী মোতাবেক ১৮৫০ সালে ভারতের উত্তর প্রদেশের কানপুরে এক সম্ভ্রান্ত আলেম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পূর্বপুরুষরা মুলতান থেকে লক্ষ্মৌতে হিজরত করেন। তারপর কানপুরে বসতি গাড়েন। তাঁর পূর্ণ বংশপরিক্রমা হ'ল- অহীদুয্যামান বিন মসীহুয্যামান বিন নূর মুহাম্মাদ বিন আহমাদ ফারূকী মুলতানী হায়দরাবাদী লক্ষ্মৌভী।

শিক্ষা-দীক্ষা :

বাবা মাওলানা মসীহুয্যামান (মৃঃ ১২৯৫ হিজরী, মক্কায়)-এর কাছেই তাঁর দ্বীনী জ্ঞানার্জনের হাতেখড়ি হয়। আট বছর বয়স পর্যন্ত তিনি বাবার কাছে অর্থসহ কুরআন মাজীদ পড়া শিখেন এবং উর্দূ-ফার্সীর প্রাথমিক পাঠ গ্রহণ করেন। এরপর মিয়াঁ নাযীর হুসাইন দেহলভী, শায়খ হুসাইন আরব ইয়ামানী (১২৪৫-১৩২৭ হিঃ), মাওলানা মুফতী এনায়েত আহমাদ (ইলমুছ ছীগাহ-এর লেখক), মাওলানা মুহাম্মাদ সালামাতুল্লাহ কানপুরী (আব্দুল আযীয মুহাদ্দিছ দেহলভীর ছাত্র), মাওলানা মুহাম্মাদ বশীরুদ্দীন কন্নৌজী (শরহে মুসাল্লামুছ ছুবূত এর লেখক), মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল হাই লক্ষ্মৌভী, মাওলানা আব্দুল হক বেনারসী (ইমাম শাওকানী ও শাহ ইসমাঈল শহীদের ছাত্র), মাওলানা মুহাম্মাদ লুতফুল্লাহ আলীগড়ী, শায়খ আহমাদ বিন ঈসা আশ-শারকী, মাওলানা হাফেয আব্দুল আযীয লক্ষ্মৌভী, মাওলানা বদরুদ্দীন মাদানী, মাওলানা ফযলুর রহমান মুরাদাবাদী প্রমুখের কাছে তাফসীর, হাদীছ, ফিকহ প্রভৃতি বিষয় অধ্যয়ন করেন। মাত্র ১৫ বছর বয়সে তিনি কানপুরের 'ফয়যে আম' মাদরাসা থেকে ফারেগ হন।

কর্মজীবন :

১২৮৩ হিঃ/১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে বাবা মাওলানা মসীহুয্যামান হায়দরাবাদ সরকারের (দাক্ষিণাত্য, ভারত) অধীনে অহীদুয্যামানের চাকুরির ব্যবস্থা করে দেন। ৩৪ বছর পর্যন্ত তিনি সেখানে চাকুরি করেন এবং বিভিন্ন পদে সমাসীন হন। হায়দরাবাদ সরকারের পক্ষ থেকে তাঁকে 'ওয়াকার নওয়ায জঙ্গ বাহাদুর' (وقار نواز جنگ بهادر) উপাধি প্রদান করা হয়।

কুরআন মাজীদ মুখস্থকরণ :

তিনি বাল্যকাল থেকেই প্রচণ্ড ধীশক্তির অধিকারী ছিলেন। অধ্যয়নের প্রতি তাঁর আকর্ষণ ছিল দুর্নিবার। তাই চাকুরিরত অবস্থায় ২৩ বছর বয়সে কুরআন মাজীদ মুখস্থের সাধ মনে জাগে। দেড় বছরে তিনি সম্পূর্ণ কুরআন মাজীদ মুখস্থ করেন। জীবন-প্রদীপ নিভে যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত প্রত্যেক মাসে দু'বার কুরআন খতম দেয়া তাঁর নিয়মিত অভ্যাসে পরিণত হয়েছিল।

কাব্য-প্রতিভা ও ইংরেজীতে দক্ষতা অর্জন :

কবিতা রচনায়ও তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। আরবী-উর্দূ দু'ভাষাতেই তাঁর কবিতা পাওয়া যায়। ১২৯৮ হিজরীতে ৬

* এম.ফিল গবেষক, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

মাসে ইংরেজী ভাষায় এতটাই দক্ষতা অর্জন করেছিলেন যে, বিভিন্ন মিটিংয়ে ইংরেজীতে বক্তৃতা দিতেন।

হজ্জ আদায় :

তিনি মোট তিনবার (১২৮৭, ১২৯৪ ও ১৩৩২ হিঃ) হজ্জ আদায় করেন। প্রথম দু'বার বাবা মাওলানা মসীহুয্যামান-এর সাথে এবং তৃতীয়বার স্বপরিবারে। ইচ্ছা ছিল হজ্জ শেষে মদীনা মুনাওয়ারায় বসবাস করা। কিন্তু নানা কারণে তা সম্ভব না হওয়ায় তিনি দেশে ফিরে আসেন। পরবর্তীতে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের রণদামামা বেজে উঠলে মদীনায় বসবাসের সাধ তাঁর অপূর্ণই থেকে যায়।

মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় পরিষদ সদস্য :

মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য ১৩৩২ হিঃ/১৯১৩ খৃষ্টাব্দে একটি পরিষদ গঠন করা হয়। মাওলানা অহীদুয্যামান এ পরিষদের অন্যতম সদস্য ছিলেন।

দেশ ও জাতির খেদমত :

চাকুরি জীবন এবং কুতুবে সিত্তাহ্র অনুবাদ ও গ্রন্থ রচনার ব্যস্ততার মাঝেও তিনি নাদওয়াতুল ওলামা, লক্ষ্ণৌ, আলীগড় কলেজ (পরবর্তীতে বিশ্ববিদ্যালয়), মাদরাসা ফয়যে আম (কানপুর), আহলেহাদীছ মাদরাসা সমূহের পরিচালনা পরিষদ প্রভৃতি সামাজিক ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের সাথে যুক্ত ছিলেন। এসব প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে তিনি বক্তৃতা দিতেন।

কুতুবে সিত্তাহ্র উর্দূ অনুবাদে ভূপালীর অনুপ্রেরণা :

নওয়াব ছিদ্দীক হাসান খান ভূপালী (১৮৩২-৯০) মাওলানা অহীদুয্যামানকে কুতুবে সিত্তাহ (ছহীহ বুখারী, ছহীহ মুসলিম, আবূ দাঊদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনু মাজাহ)-এর উর্দূ অনুবাদ করার জন্য অনুপ্রাণিত করেন এবং এর জন্য মাসিক ৫০ রূপী মাসহারা নির্ধারণ করেন। বড় ভাই মাওলানা বদীউয্যামান (১২৫০-১৩০৪ হিঃ) ছোট ভাই অহীদুয্যামানকে লিখিত এক পত্রে বলেন, 'নওয়াব ছিদ্দীক হাসান খান ভূপালী ১২৯৪ হিজরী থেকে তোমার ও আমার উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবগত হয়ে অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছেন এবং কুতুবে সিত্তাহ্র অনুবাদের দায়িত্ব অর্পণ করেছেন। একাজে সময় ব্যয়ের জন্য তিনি মাসিক ৫০ রূপী বেতনও নির্ধারণ করেছেন'।

হানাফী থেকে আহলেহাদীছ : জীবনের মোড় পরিবর্তন

মাওলানা জীবনের প্রথম দিকে কট্টর হানাফী ছিলেন। হানাফী থাকা অবস্থায় তিনি শরহে বেকায়ার শরাহ 'নূরুল হেদায়া' লিখেন। এর মুখবন্ধে তিনি তাক্বলীদে শাখছী অপরিহার্য মর্মে বিভিন্ন দলীল পেশ করেন। তাছাড়া এ গ্রন্থের অন্যান্য জায়গায় আহলেহাদীছ মাসলাকের কড়া সমালোচনা করতেও কসুর করেননি। কিন্তু পরবর্তীতে বড় ভাই মাওলানা বদীউয্যামান (যিনি পাক্কা আহলেহাদীছ ছিলেন)-এর সাথে মতবিনিময়ের ফলে মাযহাবী তাক্বলীদ ছেড়ে ছহীহ দলীলের অনুসরণ করতে শুরু করেন। মাওলানা আব্দুল হাই লক্ষ্ণৌভী (হানাফী) মাওলানা সম্পর্কে লিখেছেন যে, كان شديدا فى التقليد فى بدايـــة أمـــره ثم رفضه وتحرر واختـــار مـــذهب أهـــل حـــديث. 'তিনি প্রথমদিকে কট্টর মুক্বাল্লিদ ছিলেন। অতঃপর তাক্বলীদের বন্ধন মুক্ত হয়ে আহলেহাদীছ মতাদর্শ গ্রহণ করেন'।

মাওলানা অহীদুয্যামান তাঁর বড় ভাইয়ের দ্বারা দারুণভাবে প্রভাবিত ছিলেন। বড় ভাই সম্পর্কে তিনি লিখেছেন, 'মৌলভী হাজী বদীউয্যামান ১৩১২ হিজরীতে হায়দরাবাদে আনুমানিক ষাট বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন এবং এই শহরেই তাঁকে দাফন করা হয়। তিনি অতুলনীয় বাগ্মী ছিলেন। তাঁর সুরেলা কণ্ঠের বক্তৃতার প্রশংসা মাদ্রাজ, বেঙ্গালুরু, হায়দরাবাদ, বাংলা, পাঞ্জাব, রেঙ্গুন (মিয়ানমার) কলকাতা, দিল্লী এবং লক্ষ্ণৌর প্রত্যেক শহরে সকলের মুখে মুখে ধ্বনিত হ'ত'।

চরিত্র-মাধুর্য :

মাওলানা অহীদুয্যামান চরিত্রবান, নম্র, বিনয়ী, পরিশ্রমী, কষ্টসহিষ্ণু, অতিথিপরায়ণ, উদার, মিশুক ও রসিক ছিলেন। হক কথা বলতে সামান্যতম দ্বিধা করতেন না। অল্প বয়স থেকেই তাহাজ্জুদগুযার ছিলেন। জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত এ অভ্যাস বজায় ছিল। তিনি স্বীয় রচনাবলীর কোন রয়্যালিটি নিতেন না। বাহাছ-মুনাযারা একেবারে অপসন্দ করতেন।

রচনাবলী :

তাঁর রচনাবলীর সংখ্যা প্রায় ১০০। নিম্নে উল্লেখযোগ্য রচনার তালিকা প্রদান করা হ'ল-

কুরআন মাজীদ : ১. মুওয়াযিহাতুল ফুরক্বান (কুরআন মাজীদের উর্দূ অনুবাদ) ২. তাফসীরে ওয়াহীদী ৩. লুগাতুল কুরআন ৪. বিশারাতুল ইখওয়ান বি-ফাযায়িলিল কুরআন ৪. তাববীবুল কুরআন লিযাবতি মাযামীনিল ফুরক্বান।

হাদীছ : ১. তায়সীরুল বারী (বুখারীর সটিকা অনুবাদ) ২. তাসহীলুল কারী (উর্দূতে ছহীহ বুখারীর বিস্তারিত ব্যাখ্যা গ্রন্থ) ৩. আল-মু'লিম (সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা সহ ছহীহ মুসলিমের অনুবাদ) ৪. কাশফুল মুগাত্তা (মুওয়াত্ত্বা ইমাম মালেকের অনুবাদ ও ব্যাখ্যা) ৫. আল-হুদা আল-মাহমূদ (আবূ

দাঊদের অনুবাদ) ৬. রাওযুর রুবা (নাসাঈর অনুবাদ ও ব্যাখ্যা) ৭. রাফ'উল আজাজাহ (ইবনু মাজাহ-এর অনুবাদ) ৮. ইশরাকুল আবছার ফী তাখরীজি আহাদীছি নূরিল আনওয়ার (আরবী) ৯. আহসানুল ফাওয়ায়েদ ফী তাখরীজি আহাদীছি শরহিল আক্বায়েদ (আরবী) ১০. আনওয়ারুল লুগাহ ওয়া আসরারুল লুগাহ (হাদীছের দুর্বোধ্য শব্দের ব্যাখ্যা। ২৮ খণ্ডে সমাপ্ত)।

ফিক্বহ : ১. নূরুল হেদায়া (শরহে বেকায়ার অনুবাদ ও ব্যাখ্যা) ২. কানযুল হাকায়িক্ব ফী ফিক্বহি খায়রিল খালায়িক্ব (আরবীতে ফিক্বহুল হাদীছ বিষয়ক গ্রন্থ) ৩. নুযুলুল আবরার মিন ফিক্বহিন নাবিইয়িল মুখতার (আরবী) ৪. হাদিয়াতুল হুদা মিনাল ফিক্বহিল মুহাম্মাদী (আরবী; ৭ খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে)। প্রথম খণ্ড আক্বীদা সম্পর্কিত, ২য় খণ্ড দলীল সাব্যস্তকরণের পদ্ধতি এবং পরবর্তী চার খণ্ড ফিক্বহী মাসায়েল সংক্রান্ত। প্রত্যেক খণ্ডের ভিন্ন ভিন্ন নাম। যেমন ৭ম খণ্ডের নাম 'তানক্বীদুল হেদায়াহ ওয়া তাসদীদুর রিওয়াহ ও ইছলাহুল হেদায়া'। এ খণ্ডটি ১৩৩৮ হিজরীতে মাওলানার মৃত্যুর দু'মাস পর তদীয় পুত্র মাওলানা আহসানুয্যামানের তত্ত্বাবধানে লক্ষ্ণৌর মুজতাবায়ী প্রেস থেকে মুদ্রিত হয়। ৫. তাশরীহুল হজ্জ ওয়ায যিয়ারাহ (উর্দূ)।

আক্বীদা : ১. আল-ইস্তিহার ফিল ইস্তিওয়া (আল্লাহ্র আরশে সমাসীন হওয়া সম্পর্কিত বিস্তারিত আলোচনা) ২. আক্বীদায়ে আহলে সুন্নাত (একই বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা) ৩. ফাতাওয়া বে-নযীর দর নফিয়ে মিছলে আঁ-হযরত বাশীর ওয়া নাযীর (উর্দূ) ৪. আল-হাশিয়া আল-ওয়াহীদিয়াহ আলাল হাশিয়া আয-যাহিদিয়াহ।

বিবিধ : ১. রাহে নাজাত (উর্দূ) ২. তাযকেরাতুল ওয়াহীদ (১৩২৭ হিজরী পর্যন্ত আত্মজীবনী) ৩. তাক্বরীরে দিলপযীর হিন্দু-মুসলমান ৪. মাযামীনে সাব'আ ৫. কাওয়ায়িদে মুহাম্মাদী (উর্দূ) ৬. মাজমূ'আয়ে কাওয়ানীনে মালী সরকারে নিযাম ওয়া রিপোর্ট লোকাল ফান্ড ৭. তারীখে মামালিকে মাহরূসাহ সরকারে নিযাম হায়দরাবাদ (দাক্ষিণাত্য, ভারত)।

কানযুল উম্মাল-এর শুদ্ধিকরণ :

তিনি 'কানযুল উম্মাল' নামক হাদীছ সংকলনের ভুল-ভ্রান্তি যোগ্যতার সাথে সংশোধন করেন।

জীবনের শেষ দিনগুলি ও মৃত্যু :

১৩১৮ হিজরীতে সরকারী চাকুরি থেকে অবসর গ্রহণের পর দিন-রাত ইবাদত-বন্দেগী এবং অনুবাদ ও গ্রন্থ রচনায় কাটাতে থাকেন। ১৩৩২ হিজরীতে হজ্জ আদায় শেষে দেশে ফিরে এসে হায়দরাবাদের পরিবর্তে মাদ্রাজের বিভিন্ন স্থানে বসবাস করেন। জীবনের শেষ বছর ১৩৩৭ হিঃ/১৯১৯ খৃষ্টাব্দে হায়দরাবাদ যেলার অকারাবাদে আসেন। এখানেই ৬ শা'বান ১৩৩৮ হিজরী মোতাবেক ২৬ এপ্রিল ১৯২০ খৃষ্টাব্দে তদীয় পুত্র মুহাম্মাদ মুহসিন ভরা যৌবনে ইন্তেকাল করেন। পুত্রবিয়োগ শোকে মূহ্যমান মাওলানা ১৯ দিন পর ২৫ শা'বান ১৩৩৮ হিঃ/১৫ মে ১৯২০ সালে ৭০/৭১ বছর বয়সে অকারাবাদে ইন্তেকাল করেন এবং সেখানেই তাঁকে দাফন করা হয়।

উপসংহার :

পরিশেষে বলা যায়, মাওলানা অহীদুয্যামান ভারতীয় উপমহাদেশের একজন খ্যাতিমান মুহাদ্দিছ ছিলেন। সরকারী চাকুরির ব্যস্ততার মাঝেও তাঁর লেখনীর ঝর্ণাধারা অব্যাহত ছিল। কুরআন মাজীদের উর্দূ অনুবাদ, তাফসীর, হাদীছ, ফিক্বহ, আক্বায়েদ প্রভৃতি বিষয়ে তাঁর রচনার সংখ্যা একশ' ছুঁই ছুঁই। কুতুবে সিত্তাহ্র উর্দূ অনুবাদ করে তিনি ভারতীয় উপমহাদেশে হাদীছ চর্চার ইতিহাসে অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। উদার মন নিয়ে কুরআন-হাদীছ গবেষণা করলে তাক্বলীদী ঝঞ্ঝাপীড়িত ব্যক্তিও যে সঠিক পথের দিশা পেতে পারে, মাওলানা অহীদুয্যামান তার অত্যুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। আল্লাহ তাঁকে জান্নাতুল ফেরদৌস দান করুন! আমীন!!

নবীনদের পাতা

অশান্ত মধ্যপ্রাচ্য : উৎসের সন্ধানে

*যাকওয়ান হুসাইন**

ফিলিস্তীন প্রসঙ্গ বাদ দিলে মধ্যপ্রাচ্যের রাজনৈতিক পরিস্থিতি মোটামুটি স্থিতিশীলই ছিল গত কয়েক দশক। এ কথা অনস্বীকার্য যে, রাজতন্ত্র আর যাইহোক স্থিতিশীল রেখেছিল মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোকে। কিন্তু বিদ্যুৎ চমকের মত দপ করে সারা মধ্যপ্রাচ্যে গণআন্দোলনের বহ্নিশিখা জ্বলে উঠল। চারিদিকে শুরু হ'ল একই আওয়াজ– সরকারের পতন চাই, পতন চাই। তিউনিসিয়া, মিশর, লিবিয়া, জর্ডান, লেবানন, মরক্কো হয়ে বিক্ষোভের আগুন ছড়িয়ে পড়ে জর্ডান, বাহরাইন, ইয়েমেন পর্যন্ত। এমনকি খোদ সৌদি আরবেও ছড়িয়ে পড়ে এর রেশ। অতঃপর অভূতপূর্বভাবে তাসের ঘরের মত পতন ঘটতে থাকে একের পর এক লৌহমানবখ্যাত শাসকদের। এই পতনধারার সূত্রপাত ঘটে এ বছরের শুরুতে ১৪ই জানুয়ারীতে তিউনিসিয়ার প্রেসিডেন্ট বেন আলীকে দিয়ে। তিনি ঐ দিন তার মন্ত্রীসভা ভেঙ্গে দিয়ে স্বদেশ ছেড়ে পালিয়ে যান। এই সফলতায় উৎসাহিত হয়ে গোটা মধ্যপ্রাচ্য জুড়ে শুরু হয় সরকারবিরোধী বিক্ষোভ। ক্ষোভের উত্তপ্ত দমকা বাতাসে গোটা মধ্যপ্রাচ্যের মরুবালুকা এখন গনগনে অগ্নিশিখা হয়ে জ্বলছে। কিন্তু কেন এই আন্দোলন? কেন হঠাৎ ক্ষেপে উঠল জনগণ। শাসকের শোষণ? নিরবচ্ছিন্ন বঞ্চণার ছাইচাপা দ্রোহ, না কোন ষড়যন্ত্র? এমন প্রশ্ন উঠতেই পারে। কারণ বেন আলীর ২৩ বছর, হোসনী মোবারকের ৩০ বছর, গাদ্দাফীর ৪০ বছরের ক্ষমতাকালীন এই দীর্ঘ সময়ে এমন আন্দোলন তো কখনো কেউ দেখেনি? হঠাৎ করে জনগণ বিপুল তেজে ফুঁসে উঠল কেন? তবে কেউ কি আড়াল থেকে জনগণকে ব্যবহার করে আপন স্বার্থ হাছিল করছে? উৎস কোথায় এ আন্দোলনের? বক্ষমাণ প্রবন্ধে সেটাই বিশ্লেষণের প্রয়াস পাব ইনশাআল্লাহ।

বিশাল মধ্যপ্রাচ্য : একটি বিশাল ভূ-ভাগের সম্মিলিত নাম মধ্যপ্রাচ্য। বিশ্বসভ্যতার এক সুপ্রাচীন গৌরবজ্জ্বল কেন্দ্রভূমি এই অঞ্চল। অতীতে এর বিভিন্ন এলাকা বিভিন্ন নামে পরিচিত ছিল। মধ্যপ্রাচ্য নামটি এসেছে ২য় বিশ্বযুদ্ধের সময়। সে থেকেই এ নামের ব্যাপক ব্যবহার শুরু হয়। ১ম বিশ্বযুদ্ধের আগে গোটা মধ্যপ্রাচ্য এলাকা ছিল ওছমানীয় সালতানাতের অন্তর্গত। ইউরোপে তখন এ এলাকাকে নিকটপ্রাচ্য বলে অভিহিত করা হ'ত। ১ম বিশ্বযুদ্ধের পর ওছমানীয় সালতানাত ভেঙ্গে বলকান এলাকায় অনেকগুলো স্বাধীন রাষ্ট্রের অভ্যুদয় ঘটে। তখন নিকটপ্রাচ্য নামটি অপ্রচলিত হয়ে পড়ে। ২য় বিশ্বযুদ্ধের সময় পূর্ব ইরান থেকে মিশরের পশ্চিম সীমান্ত পর্যন্ত এলাকাকে সামরিক ও ল্যান্ড লীজ পলিসির দিক দিয়ে এক মনে করা হ'ত। তখনই সামরিক বিশেষজ্ঞরা এর নামকরণ করে মধ্যপ্রাচ্য। ২য় বিশ্বযুদ্ধের পর এ এলাকাকে কেউ দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়া আবার কেউ পশ্চিম এশিয়া নামে অভিহিত করে। তবে কালক্রমে মধ্যপ্রাচ্য নামটিই অধিক জনপ্রিয়তা লাভ করে। উল্লেখ্য, অধিকাংশের মতে মুসলিম জাহানের আরবী ভাষাভাষী ২২টি দেশ নিয়ে মধ্যপ্রাচ্য গঠিত।

মধ্যপ্রাচ্যের বর্তমান পরিস্থিতির প্রেক্ষাপট : মধ্যপ্রাচ্যের প্রায় সকল রাষ্ট্রে রাজতন্ত্র বা একনায়কতন্ত্রের নামে একেক জন শাসক অনির্দিষ্ট কালের জন্য ক্ষমতা আঁকড়ে ধরে আছেন দীর্ঘদিন যাবৎ। নিজেকে অপ্রতিদ্বন্দ্বী রাজা মনে করে এসব শাসকদের অনেকেই গড়ে তুলেছেন একচেটিয়াভাবে অঢেল সম্পদের পাহাড়। তাঁদের আত্মীয়-স্বজনরা দুর্নীতির মাধ্যমে একেকজন বনে গেছে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ধনকুবের। যাদের টাকায় চলে ইউরোপ-আমেরিকার ব্যাংকগুলো। ফলে স্বভাবতই সাধারণ জনগণের স্বার্থ-চাহিদার প্রতি শাসকদের নযর ছিল শিথিল। এ অবস্থা চলে আসছে দশকের পর দশক ধরে। এতদস্বত্ত্বেও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা থাকার কারণে আরব জনগণ এ শাসনব্যবস্থার সাথে নিজেদের মানিয়ে রেখেছে দীর্ঘকাল ধরেই। কিন্তু হঠাৎই শান্ত মধ্যপ্রাচ্য অশান্ত হয়ে পড়ল। তিউনিসিয়ার রাজধানী থেকে বেশ দূরের সিরি বৌজিদ শহরে বুয়াজিজি নামক এক যুবক কোন চাকুরী জুটাতে না পেরে রাস্তায় ফল বিক্রি করত। একদিন বখরা দাবী করে বসে এক পুলিশ কর্মকর্তা। এই অন্যায় দাবী পূরণে রাযী না হওয়ায় উক্ত কর্মকর্তা তার ফলের গাড়ীটি বাজেয়াপ্ত করে। ন্যায়বিচারের আশায় বুয়াজিজি গিয়েছিল প্রশাসনের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে। কিন্তু সেখানেও সে বিচার পায়নি। ফলে সেই অফিস থেকে বেরিয়ে রাস্তায় নেমেই সে ক্ষোভে নিজের শরীরে আগুন লাগিয়ে দেয়। দিনটি ছিল ২০১০ সালের ১৭ই ডিসেম্বর। এ তরুণ যখন নিজের শরীরে আগুন লাগিয়ে দিল তখন তিউনিসিয়া, মিশর, লিবিয়া, সুদান, ইয়েমেনের শাসকরা কল্পনাও করতে পারেনি এ আগুনের আঁচ তাদের গায়ে লাগবে। বুয়াজিজির জ্বলন্ত শরীর থেকে জন্ম নেওয়া দ্রোহের স্ফুলিঙ্গে প্রথমে পুড়ল তার স্বদেশ তিউনিসিয়া। চার সপ্তাহ ধরে চলতে থাকা প্রবল গণ আন্দোলনের মুখে অবশেষে ২৩ বছরের একনায়কতন্ত্রের অবসান ঘটে। যায়নুদ্দীন বিন আলী সপরিবারে পালাতে বাধ্য হন। তারপর গোটা মধ্যপ্রাচ্য জুড়ে শুরু হয় আন্দোলন। আর সেই আন্দোলনে ঘি ঢেলে দেয় অদৃশ্য

* *আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী।*

একটি মহল। ফলে অচিন্তনীয়ভাবে দপদপ করে জ্বলে ওঠে বিক্ষোভের আগুন। যার অভাবনীয় বিস্তার দেখছে বিশ্ববাসী।

মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশের ঘটনা প্রবাহ : তিউনিসিয়ার মত মধ্যপ্রাচ্যের অন্যান্য রাষ্ট্রগুলোতেও শুরু হয় গণআন্দোলন। নিম্নে কয়েকটি দেশের পরিস্থিতি আলোচনা করা হ'ল–

মিশর : ইতিহাস-ঐতিহ্য ও রাজনৈতিক অবস্থানের দিক থেকে মধ্যপ্রাচ্যের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দেশ মিশর। বৃটিশ শাসনামল থেকে স্বাধীনতা লাভের পর থেকেই মিশর পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদী গোষ্ঠীর পদলেহী হিসাবে কাজ করে যাচ্ছে। তেল সমৃদ্ধ আরব ভূখণ্ডে পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদের দখলদারিত্ব নিশ্চিত রাখার জন্য পশ্চিমাদের সৃষ্ট জায়নবাদী রাষ্ট্র ইসরাঈলের সঙ্গে মিশর দুই দুইবার যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। প্রথমবার ১৯৭৩ সালে এবং দ্বিতীয়বার ১৯৭৬ সালে। ১৯৭৯ সালে এই মিশর সকল মুসলিম রাষ্ট্রের ঐক্যমতকে অগ্রাহ্য করে ইসরাঈলের সাথে শান্তিচুক্তি করে। তখন প্রেসিডেন্ট ছিলেন আনোয়ার সাদাত। এর খেসারত হিসাবে আততায়ীর হাতে নিহত হন প্রেসিডেন্ট আনোয়ার সাদাত। অতঃপর ১৯৮১ সালের অক্টোবর মাসে ক্ষমতায় অভিষিক্ত হন তৎকালীন ভাইস প্রেসিডেন্ট হোসনী মোবারক। ৩০ বছরে হোসনী মোবারক পরিণত হন মার্কিন-ইসরায়েল অপশক্তির পরম বন্ধুতে। তিউনিসিয়ার গণআন্দোলনের অনুসরণে অনেকটা হঠাৎ করেই শুরু হয় মিসরের গণআন্দোলন। দুর্নীতি, বেকারত্ব ও দারিদ্রের বিস্তার প্রভৃতি ইস্যু তুলে হোসনী মোবারকের পদত্যাগের দাবীতে ১২ ফেব্রুয়ারী '১১ তাহরীর স্কোয়ারে সমবেত হয়েছিল ২০ লক্ষ মানুষ। অবশেষে মাত্র ২ সপ্তাহের আন্দোলনে পদত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছেন হোসনী মোবারক।

মরক্কো : তিউনিসিয়ার গণবিক্ষোভের ধারাবাহিকতায় মরক্কোতেও তরুণরা রাজপথে নেমে আসে। খাদ্য দ্রব্যের ঊর্ধ্বমূল্য, বেকারত্ব বৃদ্ধি ও মত প্রকাশের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপের প্রতিবাদে। ২১শে জানুয়ারী আন্দোলনকারীদের চারজন শরীরে আগুন ধরিয়ে দেয়। এতে আন্দোলনের গতি আরো বৃদ্ধি পায়। পরিশেষে আন্দোলনের রেশ টেনে ধরার জন্য সুলতান মুহাম্মদের সরকার আটা, ময়দা, ভোজ্য তেল, চিনি ও জ্বালানীর উপর ভুর্তুকী প্রদানের ঘোষণা দেন।

আলজেরিয়া : তিউনিসিয়ার সবচেয়ে নিকটবর্তী রাষ্ট্র আলজেরিয়া। জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী মাস জুড়ে ক্ষোভে উত্তাল ছিল পুরো দেশ। মূলতঃ খাদ্যদ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধিকে কেন্দ্র করে আন্দোলন দানা বেঁধে উঠে। অন্তত ৮ জন বিক্ষোভকারী শরীরে আগুন ধরিয়ে দেয় বুয়াজিজির অনুকরণে। সশস্ত্র বাহিনীর সাথে সংঘাতে নিহত হয় পাঁচজন ও আহত হয় শতাধিক। শেষ পর্যন্ত সরকার বাধ্য হয় খাদ্যশস্যের মূল্য হ্রাস ও আমদানী বৃদ্ধি করতে।

জর্দান : জর্দানে বিক্ষোভ শুরু হয় জানুয়ারীর প্রথম সপ্তাহ থেকে। রাজধানী আম্মান সহ গোটা দেশের তরুণরা রাজপথে নেমে আসে মত প্রকাশের স্বাধীনতা, গণতন্ত্র ও উন্নত জীবন-যাপনের নিশ্চয়তার দাবীতে। অর্থনৈতিক বিপর্যয়, নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রীর মূল্যবৃদ্ধি ও বেকারত্বের কারণে ক্ষুব্ধ ছিল জনসাধারণ। প্রধানমন্ত্রী সামির রিকাইয়ি বিক্ষুব্ধ তরুণদের বশে আনতে নতুন অর্থনৈতিক প্যাকেজ ঘোষণা করলেও আন্দোলনের গতি বাড়তেই থাকে। শেষ পর্যন্ত বাদশাহ দ্বিতীয় আব্দুল্লাহ সামির রিফায়ির সরকারকে পদচ্যুত করে সাবেক প্রধানমন্ত্রী মারূফ আল-বাকীতকে সরকারপ্রধান হিসাবে নিয়োগ দেন।

ইয়েমেন : আরব বিশ্বের অন্যতম দরিদ্র এই দেশটির মোট জনগোষ্ঠীর প্রায় অর্ধেকই বাস করে দারিদ্রসীমার নিচে। প্রেসিডেন্ট আলী আব্দুল্লাহ দালেহ টানা ৩২ বছর ধরে রাষ্ট্র পরিচালনা করছেন। দুর্নীতি, অদক্ষতা, মতপ্রকাশের স্বাধীনতায় বাধা ও রাষ্ট্রীয় নির্যাতনের প্রতিবাদে পুরো ইয়েমেন উত্তাল থাকে জানুয়ারীর দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকে। নগরীর এডেনে এক তরুণ শরীরে আগুন লঅগিয়ে দিলে আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে সারা দেশে। আলী আব্দুল্লাহ সরকারের পদত্যাগের দাবীতে ১০ লক্ষ মানুষ রাজধানী সানার রাজপথ দখল করে। সেনাবাহিনীর বেতন-ভাতা বৃদ্ধি, নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যে সরকারী ভাতা বাড়ানোর মতো উদ্যোগেও আন্দোলনকারীরা সন্তুষ্ট না হ'লে প্রেসিডেন্ট বাধ্য হন ঘোষণা দিতে যে, পরবর্তী নির্বাচনে তিনি আর রাষ্ট্রপতি পদে প্রার্থী হবেন না।

লিবিয়া : লিবিয়ার রাজধানী ত্রিপোলী এখন রক্তাক্ত প্রান্তর। সেখানে নির্বিচারে চলছে গণহত্যা। বিরোধীদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে হত্যার শপথ নিয়েছেন প্রেসিডেন্ট গাদ্দাফি। সেনাবাহিনী লেলিয়ে দিয়েছেন বিদ্রোহীদের পেছনে। কিন্তু তবু দমেনি লিবিয়ার বিক্ষোভকারীরা। জনগণ একদফা আন্দোলন করছে চার দশকের স্বৈরশাসক কর্ণেল মুয়াম্মার গাদ্দাফীর শাসন অবসানকল্পে। কিন্তু গাদ্দাফিও ছাড়বেন না ক্ষমতা। বহির্বিশ্বের শত হুমকি নিষেধ কিছুরই তোয়াক্কা তিনি করছেন না। ফলে পুরো লিবিয়া সরকারপন্থী আর বিদ্রোহীদের পাল্টাপাল্টি আক্রমণে অগ্নিগর্ভে পরিণত হয়েছে। এই উপযুক্ত মওকা পেয়ে পশ্চিমা শক্তি সামরিক হস্তক্ষেপের নামে গত ১৯ মার্চ তারিখ হ'তে লিবিয়ায় বিমান হামলা শুরু করেছে। প্রতিনিয়ত সেখানে নিহত হচ্ছে হাযার হাযার বেসামরিক লোক।

মধ্যপ্রাচ্য আন্দোলনের উৎস : হঠাৎ ঝড়ে লু হওয়া বইছে মধ্যপ্রাচ্যে! প্রশ্ন উঠতেই পারে, কেন এই আন্দোলন?

জনগণ কি রাজতন্ত্রের হাত থেকে মুক্তি পেতে চায়? নাকি প্রায় স্থায়ী ভাবে জেঁকে বসা বঞ্চনা-লাঞ্ছনার অবসান চায়? তাহ'লে এতদিন কেন তার আলামত দেখা যায়নি? হঠাৎ কেন এভাবে জেগে উঠল তারা? আন্দোলনের কারণগুলোও দেখা যাচ্ছে প্রায় সবদেশেই এক ও অভিন্ন। তবে এসব অভিযোগ কি সত্যিই এতবড় আন্দোলন গড়ে তোলার পক্ষে খুব উপযুক্ত ইস্যু? এসব রহস্যের গোঁড়া খুঁজতে প্রথমেই আমাদের সামনে আসে আন্তর্জাতিক ইসলাম বিরোধী মহল। যারা সবসময় সুযোগ মত ইসলামের সর্বনাশ সাধনে তৎপর। এদের সর্বদা লক্ষ্য থাকে মুসলমানদের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে তাদের সর্বনাশ করা এবং বহু ইসলামী দেশের ঐক্য ও সংহতি বিনষ্ট করা। এমনটিই অনুমান করা যায় মধ্যপ্রাচ্যের ঘটনা প্রবাহে।

স্পষ্টতঃই অনভূত হচ্ছে যে, ইসলামবিদ্বেষী মহলটি এখানে সুচতুরভাবে পেছনে থেকে অদৃশ্য শক্তি হয়ে কাজ করে যাচ্ছে তাদের এজেন্ডা বাস্তবায়নে। এ দৃশ্য আমাদের ফিরিয়ে নিয়ে যায় সাতশত বছর পূর্বের স্পেনীয় মুসলিম শাসনের অবসানের দৃশ্যপটে। তৎকালীন স্পেনের মুসলমানদের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে তাদের সর্বনাশ করেছিল ইসলামবিরোধী শক্তি। তারা এমনভাবে ষড়যন্ত্রের বীজ বপন করেছিল যার জন্য মুসলমানরা তাদের সেই তেজদীপ্ত শক্তি ও সাহস নিয়ে গর্জে উঠতে পারেনি। স্পেনে মুসলিম শাসন অবসানের ঠিক আগ মুহূর্তে রাজা ফার্ডিন্যান্ড ও রাণী ইসাবেলা সৈন্যসহ গ্রানাডা নগরী ঘিরে ফেলেছে। বাদশাহ আবু আব্দুল্লাহ তখন তার মন্ত্রীদের নিয়ে রাজদরবারে বসেছেন কর্তব্য-করণীয় আলোচনা করতে। বাদশাহ সবার কাছে জানতে চাইলেন কি করা যায়? তখন তরুণ সেনাপতি মুসা বিন আবী গাস্সান দাঁড়িয়ে বললেন হে বাদশাহ! আমরা মুসলিম জাতি। আমাদের ইতিহাস ও ঐতিহ্য সংগ্রাম ও সাহসিকতার। আমাদের শরীরে সেই বীরদের রক্ত প্রবাহিত যারা নিজেদের রক্তকে ইসলামের জন্য ঢেলে দিয়েছিলেন। মুসলিম জাতি চির অজেয়। তাই আমার পরামর্শ জীবনের শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত ইসলামের জন্য যুদ্ধ করব। আসুন আমরা আমাদের সৈন্যবাহিনী নিয়ে শত্রুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ি...। কিন্তু গাদ্দারে ভরা রাজার দরবারে তার এই তেজোদ্দীপ্ত ভাষণ শোনার কেউ ছিল না। ফলে শত্রুবাহিনীর সাথে সন্ধির পক্ষেই সবাই মত দিল। যা চীরকালের জন্য স্পেনের জনসাধারণের ললাটে লিখে দিল গোলামীর অঙ্গীকারনামা। স্পেন থেকে চিরতরে বিদায় নিল ইসলামী শাসন। আজ ঠিক ঐ মহলই মধ্যপ্রাচ্যের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে। পেছন থাকে তারা জনগণকে উস্কানী দিয়ে নষ্ট করছে ইসলামী রাষ্ট্রসমূহের স্থিতিশীলতা। যার অনিবার্য ভবিষ্যৎ হ'তে পারে মধ্যপ্রাচ্যের ভাঙ্গন। আর মধ্যপ্রাচ্য ভাঙ্গলেই আরো দুর্বল হয়ে যাবে মুসলিম বিশ্ব। সেই সুযোগে মুসলমানদের চিরকালের জন্য কব্জা করে ফেলবে ঐ মহলগুলো। যেমনটি ঘটেছে ইরাক, আফগানিস্তানে। শান্তি রক্ষার দোহাই দিয়ে তারা তছনছ করে দিয়েছে দেশগুলো। হত্যা করেছে লক্ষ লক্ষ নিরপরাধ মানুষকে। আর ঐ দেশের সরকারকে করেছে তাদের নিয়ন্ত্রণাধীন। তেমনটিই তারা করতে চায় মধ্যপ্রাচ্যে। আর এই ষড়যন্ত্রকারী মহলই এ আন্দোলনের প্রধান উৎস।

কেন এই ষড়যন্ত্র : মধ্যপ্রাচ্যে যে ষড়যন্ত্র চলছে তা কিসের জন্য? কেন এই ষড়যন্ত্র? আসলে ইসলাম বিরোধী মহলটি আপাতত চায় মধ্যপ্রাচ্যের রাজনৈতিক পরিবর্তন। আর এই পরিবর্তন হ'লে উত্থান ঘটবে বিকল্প রাজনৈতিক শক্তির। আর এই রাজনীতির ধারক বাহক হবে পশ্চিমাদের পা-চাটা গোলাম। আর এই অস্থিতিশীলতা সৃষ্টির সুযোগে জন্ম হবে নতুন নতুন ইরাকের। শান্তিরক্ষার দোহাই দিয়ে সেখানে হাযির হবে পশ্চিমা শক্তি। আর তারা কব্জা করবে দেশগুলোর শাসনক্ষমতা। মুছে দেবে সেখান থেকে ইসলামের নাম ও নিশানা। মধ্যপ্রাচ্যের প্রতিটি দেশ তেল সমৃদ্ধ। গণতন্ত্রের দোহাই দিয়ে এসব দেশে একটি নড়বড়ে সরকারের ক্ষমতারোহনের পথ সুগম করে তেল হাতিয়ে নেওয়াও তাদের অন্যতম উদ্দেশ্য। তাদের সৃষ্ট জায়নবাদী রাষ্ট্র ইসরাঈলকে রক্ষা করতে হ'লে, মধ্যপ্রাচ্যে চাই তাদের অনুগত সরকার। তাদের সকল ষড়যন্ত্রের লক্ষ্য এটাই।

পরিশেষে বলব, মুসলিম জাতি সংগ্রামী জাতি। চিরদিনই তাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র হয়েছে। কিন্তু সব ষড়যন্ত্র চূড়ান্ত পর্যায়ে ব্যর্থ হয়েছে। আমরা যদি আমাদের ঐক্য ও সংহতি বজায় রাখতে পারি তাহ'লেই ষড়যন্ত্র যতই হোক তা সফল হ'তে পারবে না। অতএব আসুন হে মুসলিম উম্মাহ! নিজেদের মাঝে অপ্রয়োজনীয় লড়াই বন্ধ করি। নিজেদের ভুল নিজেরাই সংশোধনে প্রয়াসী হই। অন্যের আদর্শ, অন্যের সমাজব্যবস্থার মুখাপেক্ষী না হয়ে নিজেদের আদর্শের উপর অটল থাকি। মহান আল্লাহ্র নিকট কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা– আমরা যেন রাসূল (ছাঃ)-এর আদর্শের উপর অটল থেকে সারা পৃথিবীময় ইমারত ও খেলাফতের ভীত মজবুত করতে পারি। আল্লাহ আমাদেরকে তাওফীক্ব দান করুন- আমীন!!

মানুষের সার্বিক জীবনকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে পরিচালনার গভীর প্রেরণাই হ'ল আহলেহাদীছ আন্দোলনের নৈতিক ভিত্তি।

হাদীছের গল্প

সৎ লোকের দো'আ

এ পৃথিবীতে আল্লাহ মানুষকে প্রেরণ করেছেন তাঁর ইবাদত করার জন্য। কিন্তু মানুষ তাদের কর্তব্য ভুলে গিয়ে বিভিন্ন অন্যায় অপকর্মে লিপ্ত হয়। এরূপ মানুষ আল্লাহ্র নিকট ঘৃনিত এবং জনসমাজেও ধিকৃত। তবে যারা আল্লাহ্র নির্দেশ মেনে চলে, তাঁর অনুগত থেকে ইবাদত-বন্দেগী করে, আল্লাহ তাদের ভালবাসেন, তাদের যেকোন দো'আ কবুল করেন। এ সম্পর্কেই নিম্নের হাদীছ।-

উসায়র ইবনু আমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তাকে ইবনু জাবিরও বলা হয়, তিনি বলেন, ইয়েমেনের বসবাসকারীদের পক্ষ থেকে ওমর (রাঃ)-এর নিকট সাহায্যকারী দল আসলে তিনি তাদেরকে প্রশ্ন করতেন, তোমাদের মাঝে উয়াইস ইবনু আমির আছে কি? অবশেষে (একদিন) উয়াইস (রাঃ) এসে গেলেন। তাকে তিনি (ওমর) প্রশ্ন করলেন, আপনি কি উয়াইস ইবনু আমির? সে বলল হ্যাঁ। ওমর (রাঃ) আবার বললেন, 'মুরাদ' সম্প্রদায়ের উপগোত্র 'কারনের' লোক? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তিনি বললেন, আপনার কি কুষ্ঠরোগ হয়েছিল, তা হ'তে সুস্থ হয়েছেন এবং মাত্র এক দিরহাম পরিমাণ স্থান বাকী আছে? তিনি বলেন, হ্যাঁ। তিনি বললেন, আপনার মা জীবিত আছে কি? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তিনি (ওমর) বললেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে আমি বলতে শুনেছি, 'ইয়ামানের সহযোগী দলের সাথে উয়াইস ইবনু আমির নামক এক লোক তোমাদের নিকট আসবে। সে 'মুরাদ' জাতির উপজাতি 'কারনের' লোক। তার কুষ্ঠরোগ হবে এবং তা হ'তে সে মুক্তি পাবে, শুধুমাত্র এক দিরহাম পরিমাণ স্থান ছাড়া। তার মা বেঁচে আছে, সে তার মায়ের খুবই অনুগত। সে (আল্লাহ্র উপর ভরসা করে) কোন কিছুর শপথ করলে তা আল্লাহ তা'আলা পূরণ করে দেন। তুমি যদি তাকে দিয়ে তোমার গুনাহ মাফের জন্য দো'আ করাবার সুযোগ পাও তাহ'লে তাই করবে'। ওমর (রাঃ) বলেন, কাজেই আমার অপরাধ ক্ষমার জন্য আপনি দো'আ করুন। অতএব তিনি (উয়াইস) ওমরের অপরাধের ক্ষমা চেয়ে দো'আ করলেন। ওমর (রাঃ) তাকে বললেন, আপনি কোথায় যেতে চান? তিনি বললেন, কূফা (যাবার ইচ্ছা আছে)। তিনি (ওমর) বলেন, আমি সেখানকার গভর্ণরকে আপনার (সাহায্যের) জন্য লিখে দেই? তিনি বললেন, আমার নিকট গরীব-মিসকীনদের মাঝে বসবাস করাই বেশী পসন্দীয়। পরের বছর কূফার এক নেতৃস্থানীয় লোক হজ্জে এলো। তার সাথে ওমরের দেখা হ'লে তিনি উয়াইস সম্পর্কে তাকে প্রশ্ন করলেন। সে বলল, আমি তাকে এরকম অবস্থায় দেখে এসেছি যে, তার ঘরটা অত্যন্ত জীর্ণ অবস্থায় আছে এবং তার জীবন-যাপনের উপকরণসমূহ খুবই নগণ্য। ওমর (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, 'উয়াইস ইবনু আমির নামক এক লোক ইয়ামানের সাহায্যকারী দলের সাথে তোমাদের নিকট আসবে। সে 'মুরাদ' জাতির উপজাতি 'কারন' বংশীয় লোক। তার কুষ্ঠ রোগ হবে এবং তা থেকে সে মুক্তি পাবে, শুধুমাত্র এক দিরহাম পরিমাণ স্থান ছাড়া। তার মা বেঁচে আছে এবং সে তার মায়ের খুবই অনুগত। সে (আল্লাহ্র উপর ভরসা করে) কোন কিছুর শপথ করলে তা আল্লাহ পূরণ করে দেন। তুমি যদি তোমার গুনাহ মাফের জন্য তাকে দিয়ে দো'আ করানোর সুযোগ পাও, তাহ'লে তাই করবে'। লোকটি ফিরে এসে উয়াইসের নিকট গিয়ে বলল, আমার অপরাধ ক্ষমার জন্য আপনি দো'আ করুন। তিনি (উয়াইস) বললেন, এইমাত্র মঙ্গলময় সফর থেকে প্রত্যাবর্তন করেছেন; বরং আপনি আমার অপরাধ ক্ষমার জন্য দো'আ করুন। তিনি বললেন, আপনি কি ওমরের সাথে সাক্ষাৎ করেছেন। সে বলল, হ্যাঁ। তার জন্য উয়াইস দো'আ করলেন। উয়াইসের মর্যাদা সম্পর্কে লোকেরা সচেতন হ'লে সেখান থেকে উয়াইস অন্য স্থানে চলে গেলেন। হাদীছটি ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেছেন।

মুসলিমের আরেক বর্ণনায় উসায়র ইবনু জাবির (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, ওমর (রাঃ)-এর নিকট কূফার অধিবাসীরা একটি সাহায্যকারী দল পাঠায়। দলের এক লোক উয়াইসকে বিদ্রূপ করত। ওমর (রাঃ) বললেন, এখানে 'কারন' বংশীয় কেউ আছে কি? ঐ ব্যক্তিটি উঠে আসলে ওমর (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, ইয়েমেন থেকে উয়াইস নামে এক লোক তোমার নিকট আসবে। সে তার মাকে ইয়ামানে একা রেখে আসবে। তার কুষ্ঠরোগ হবে। সে আল্লাহ্র নিকট দো'আ করবে, আল্লাহ তার রোগমুক্তি দান করবেন, শুধুমাত্র এক দীনার অথবা এক দিরহাম পরিমাণ স্থান ছাড়া। তোমাদের মধ্যে যে কেউ তার দেখা পেলে, তাকে দিয়ে সে যেন তার গুনাহ মাফের জন্য দো'আ করায়'।

মুসলিমের আরেক বর্ণনায় ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, 'পরবর্তীদের (তাবিঈ) মধ্যে উয়াইস নামে এক সৎ লোক হবে। তার মা বেঁচে আছে। তার শরীরে কুষ্ঠের চিহ্ন থাকবে। তার নিকট গিয়ে নিজের গুনাহ মাফের জন্য তাকে দিয়ে প্রার্থনা করাও' *(মুসলিম হা/২৫৪২/২২৫)*।

পরিশেষে বলব, আল্লাহ আমাদেরকে উয়াইস ইবনু আমিরের মত সৎ কর্মশীল বান্দা হওয়ার তাওফীক দান করুন- আমীন!

মুসাম্মাৎ শারমীন আখতার

গল্পের মাধ্যমে জ্ঞান
কূট কৌশলের পরিণাম

একজনের অধিকারে অন্যজনের অন্যায় হস্তক্ষেপের ফলেই জগতে অশান্তি সৃষ্টি হয়ে থাকে। জগতের অধিকাংশ যুদ্ধ-বিগ্রহ এ অন্যায় হস্তক্ষেপের কারণেই সংঘটিত হয়েছে। কিন্তু এ অশান্তি দীর্ঘদিন স্থায়িত্ব লাভ করতে পারে না। তবুও এ অশান্তির শিকার হয় অগণিত মানুষ। এ সম্পর্কে নিম্নের কাহিনী।

অনেক দিন আগের কথা। পাশাপাশি দু'টি মুসলিম রাজ্য। রাজ্য দু'টির মধ্যে সখ্যতা বিদ্যমান। এক রাজ্যের বড় শাহজাদার নাম হারূণ। ছোট শাহজাদা ইমরান। সে বাদশাহর দ্বিতীয় স্ত্রীর সন্তান। বড় শাহজাদা হারূণ বাদশাহর মত সৎ এবং রাজ্যের দায়িত্ব ভার গ্রহণে উপযুক্ত। বাদশাহর ইচ্ছা, তিনি বড় শাহজাদার উপর রাজ্য পরিচালনার ভার অর্পণ করে বাকী জীবনটা আরাম-আয়েশে কাটাবেন। কিন্তু তাঁর সে ইচ্ছার চরম অন্তরায় হয়ে দাঁড়ালেন তাঁর বেগম। বেগমের ছেলে ইমরানও বেশ বড় হয়েছে। বেগমের ইচ্ছা, ইমরানই সিংহাসনের অধিকার লাভ করুক। সিংহাসনের ন্যায্য অধিকার বড় ছেলে হারূণের। বেগম জানেন, বাদশাহর কাছে তাঁর ছেলেকে রাজ্যভার অর্পণের কথা জানালে তাতে বাদশাহর সম্মতি পাওয়া যাবে না। তাই এ ব্যাপারে তিনি কিছু কূট কৌশলের আশ্রয় নেওয়া প্রয়োজন বোধ করলেন।

বাদশাহ অতি সুশাসক। তাঁর রাজ্যে কোথাও কোন গোলমাল-গোলযোগ নেই। রাজ্যের সর্বত্রই শান্তি বিরাজিত। এমন দিনে এক প্রজা বাদশাহর দরবারে এসে অভিযোগ দায়ের করল যে, কে একজন তার কন্যাকে অপহরণ করেছে। সে এর উপযুক্ত বিচার চায়। বাদশাহ অভিযোগ শুনে একেবারে বিস্মিত হয়ে গেলেন। এত বড় অনাচার কি করে, কার দ্বারা সাধিত হ'ল? অতি সত্বর তদন্ত করে আসামীকে রাজ দরবারে উপস্থিত করার জন্য বাদশাহ প্রধান সেনাপতিকে দায়িত্ব দিলেন। তদন্তে পাওয়া গেল, বাদশাহর দ্বিতীয় ছেলে ইমরানই এ অপকর্ম করেছে। বাদশাহর কর্ণগোচর হওয়ার পূর্বেই বিষয়টি বেগম জানল। তিনি ছেলেকে এ কাজের জন্য খুব তিরস্কার করেন। কেননা বিষয়টি ফাঁস হয়ে গেলে তাঁর উদ্দেশ্য সাধনে চরম বাধা হবে। তাই তিনি অন্দর মহলের ঝি দ্বারা প্রধান সেনাপতিকে গোপনে ডাকলেন। তিনি সেনাপতিকে প্রচুর উপঢৌকন দ্বারা বশীভূত করে ফেললেন। বিষয়টি যাতে কোনক্রমেই ফাঁস না হয় সেজন্য তাকে বিশেষভাবে বললেন। এমনকি বাদশাহও যাতে এটা জানতে না পারে তার ব্যবস্থা করতে বললেন। ইনাম গ্রহণ করে সেনাপতি বাদশাহকে জানালেন, তদন্তে দোষী কাউকে পাওয়া গেল না। অভিযোগটি মিথ্যা প্রতিপন্ন হ'ল। কাউকে আসামী হয়ে কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হ'ল না।

রাজা-বাদশাহদের একটি শখ শিকারে বের হওয়া। এতে নাকি তাঁদের মানসিক অশান্তি দূরীভূত হয়। বড় ছেলেকে কোন অজ্ঞাত কারণে একটু বিমর্ষ বলে মনে হ'ল বাদশাহর। তাই তিনি তাকে শিকারে যেতে আদেশ করলেন। পার্শ্ববর্তী রাজ্যের রাজকন্যা জাহানারাও সঙ্গী-সাথী সহ একই বনে শিকারে উপস্থিত। একটি পাখীকে উভয়েই তীর নিক্ষেপ করল। দু'টি তীরই পাখীর দেহে বিদ্ধ হয়ে পাখীটি মাটিতে পড়ে গেল। শাহজাদা বলল, আপনার তীরের আঘাতে পাখীটি ধরাশায়ী হয়েছে। অতএব পাখীটি আপনার। রাজকন্যাও অনুরূপ বলল। উভয়ের মধ্যে পরিচয়-পরিচিতি হ'ল। শাহজাদা মনে মনে তাকে বিয়ে করার সিদ্ধান্ত নিয়ে রাজবাড়ীতে ফিরে এসে পিতাকে তার সিদ্ধান্তের কথা জানালেন। আগে থেকে পার্শ্ববর্তী ঐ রাজ্যের সাথে সখ্যতা ছিল। বাদশাহ তাই সানন্দে শাহজাদার প্রস্তাবে রাজী হয়ে সত্বরই আনুষ্ঠানিকভাবে বিয়ের কাজ সম্পাদন করে দিলেন।

এখন বাদশাহর একটি কাজ বাকী। তাহ'ল শাহজাদাকে রাজ্যভার অর্পণ করা। বাদশাহ এজন্য পূর্ব আয়োজনে হাত দিলেন। বেগম দেখলেন, তাঁর উদ্দেশ্য সফল করতে আর দেরি করা চলে না। তাই তিনি মনে মনে সিদ্ধান্ত নিলেন, শাহজাদাকে কিছু পান করিয়ে সাময়িক উম্মাদ করে দিবেন। এজন্য তিনি শরবত তৈরী করে ঝি দ্বারা বড় শাহজাদাকে ডাকলেন। শাহজাদা বিমাতাকে মায়ের সম্মান দিয়ে থাকে। মায়ের ডাক পেয়ে ছেলে এলে মা বললেন, তোমার জন্য আমি এ শরবত তৈরী করে রেখেছি, পান কর। বেগমের বাহ্যিক আচরণে কোন সন্দেহের কারণ ছিল না। কিন্তু তিনি অন্তরে শাহজাদার প্রতি চরম বৈরিতা পোষণ করেন। শাহজাদা কোনরূপ সন্দেহ-সংশয়ে না পড়ে সরল মনে শরবত পান করল। সাথে সাথে তার পাগলামি শুরু হয়ে গেল। বেগম বাদশাহকে তাঁর কক্ষে ডাকলেন। স্বচক্ষে তার এরূপ আচরণ লক্ষ্য করে তার প্রতি তাঁর ধারণা পাল্টে গেল। তিনি ছেলেকে রাজবাড়ী হ'তে বের করে বনবাসে পাঠালেন। শাহজাদার স্ত্রীও স্বামীর সঙ্গে বনবাসে যেয়ে এক লোকের আশ্রয়ে উঠল।

এরপর বেগম গোপনে প্রধান সেনাপতিকে ডাকলেন। তিনি সেনাপতিকে আগে থেকে আরো বেশী ইনাম প্রদানের প্রতিশ্রুতিতে বাদশাহকে বন্দী করে কারাগারে পাঠাতে বললেন। সেনাপতি বাদশাহকে কারাগারে আবদ্ধ করলেন। বেগম এবার তাঁর ছেলেকে সিংহাসনে বসালেন। ইমরান এখন বাদশাহ, রাজ্যের সর্বেসর্বা। বাদশাহ হয়েই সে নতুন নতুন আইন জারী করে প্রজাদের উপর যুলুম করতে লাগল। বেগম এতে বাধা দিলেন। কিন্তু সে তার মায়ের কথায় কান দিল না। প্রজারা ক্ষিপ্ত হ'তে লাগল।

নতুন বাদশাহ তার মায়ের মতই কূট কৌশলী। সে জানে, এবার সেনাপতি প্রতিশ্রুত উপঢৌকন দাবী করবে। তাই সে সেনাপতিকে ইনাম প্রদানে ডাকল। সেনাপতি আসলে তরবারী উঁচিয়ে বলল, ইনামের লোভে যে ব্যক্তি একজন সৎ বাদশাহকে কারাগারে পাঠাতে পারে, ইনামের লোভে সে আমারও চরম ক্ষতি করতে পারে। এ বলেই তাকে শেষ করে দিল।

বাদশাহর বিহাই বাদশাহ সমস্ত সংবাদ অবগত হওয়ার পর প্রথমে জামাই ও মেয়েকে নিজ প্রাসাদে আনলেন। এরপর তিনি জামাই সহ সামরিক অভিযান পরিচালনা করে বন্দী দশা হ'তে বাদশাহকে উদ্ধার করেন। নতুন বাদশাহ ও বেগমকে বন্দী করা হয়। বেগম বুঝলেন, এখন তাদের মৃত্যু অবধারিত। তিনি বার বার বলতে লাগলেন, সব অপকর্মের জন্য আমিই দায়ী। আমাকে মেরে ফেলুন। আমার ছেলেকে প্রাণে মারবেন না। তার কোন দোষ নেই। কিন্তু উভয়কেই মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হ'ল। বড় শাহজাদা কণ্টকমুক্ত হয়ে সিংহাসনে আরোহন করল। রাজ্যে আগের মত শান্তি ফিরে আসতে লাগল।

উপদেশ : লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু।

** মুহাম্মাদ আতাউর রহমান*
সাং সন্ন্যাসবাড়ী, বান্দাইখাড়া, নওগাঁ।

চিকিৎসা জগৎ

কিডনী রোগ চিকিৎসায় খাদ্যের ভূমিকা

কিডনী রোগের নাম শুনলেই সাধারণ মানুষ আঁৎকে উঠে। মনে মনে ভাবতে থাকে যে, জীবন সায়াহ্নে এসে পৌঁছে গেছি। এ থেকে রক্ষা পাবার আর বোধহয় কোন উপায় নেই। ছুটাছুটি শুরু হয় বিদেশে উন্নত চিকিৎসার জন্য। আমাদের দেশে কিডনী রোগীর সংখ্যা প্রতিনিয়ত আশংকাজনক হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিভিন্ন ধরনের কিডনী রোগ রয়েছে। এর মধ্যে কিছু কিছু কিডনী রোগ আছে, সময়মত উপযুক্ত চিকিৎসা না পেলে কিডনী ফেইলুর হয়ে যায়। অর্থাৎ কিডনী স্বাভাবিক কাজ করতে পারে না। কিডনী ফেইলুরের অন্যতম কারণ হ'ল অনিয়ন্ত্রিত উচ্চ রক্তচাপ এবং ডায়াবেটিস রোগ। মেডিসিন বা অন্য চিকিৎসার পাশাপাশি কিডনী ফেইলুরে Dietary modification-এর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। কিডনী ফাংশন এবং ফেইলুরের ধাপ ও অন্যান্য অংগের ফাংশন নিরূপণ করে উপযুক্ত খাদ্যতালিকা অনুযায়ী সুষম খাবার খেলে রোগী প্রায় স্বাভাবিক জীবনযাপন করতে পারে। ডায়েটের উদ্দেশ্যই হ'ল- (১) সঠিক পুষ্টিমান বজায় রাখা, (২) কিডনীজনিত বিষক্রিয়া কমিয়ে রাখা, (৩) শরীরের প্রয়োজনীয় প্রোটিন ভেঙ্গে যেতে বাধা দেয়া, (৪) রোগীর শরীর ভাল লাগা এবং কিডনী ফেইলুরের বর্তমান অবস্থান যেন আর আগাতে না পারে (৫) ডায়ালাইসিসের প্রয়োজনীয়তার দূরত্ব কমিয়ে আনা। চিকিৎসা বিজ্ঞানীগণ একমত হয়েছেন যে, প্রয়োজনীয় প্রোটিন (Amino acid of high biological) দিতে হবে, যেমন ডিম ও দুধ থেকে। অন্যান্য প্রোটিন সীমিতকরণ করতে হবে। কারণ ঐসব প্রোটিন শরীরে জমা হয়ে ইউরিয়া, নাইট্রোজেন তৈরি করে। পাশাপাশি পর্যাপ্ত পরিমাণে অপ্রোটিন জাতীয় ক্যালরী দিতে হবে প্রোটিনের যথাযথ ব্যবহারের জন্য এবং অভ্যন্তরীণ প্রোটিনকে সুরক্ষার জন্য।

খাদ্যশক্তি : এই রোগীকে পর্যাপ্ত পরিমাণ ক্যালরী দিতে হবে। পর্যাপ্ত ক্যালরী না দিলে শরীরের টিস্যু ভেঙ্গে রক্তে ইউরিয়া এবং পটাসিয়ামের মাত্রা বেড়ে গেলে কিডনীর পক্ষে ঐগুলো অপসারণ করা দুঃসাধ্য হয়। প্রাপ্ত বয়স্কদের দিতে হবে ৩৫-৪০ কিলোক্যালরী, শরীরের প্রতি কেজি আদর্শ ওযনের জন্য অথবা ২০০০-৩০০০ কিলোক্যালরী প্রতিদিন যারা নিয়মিত হিমোডায়ালাইসি/পেরিটনিয়েল ডায়ালাইসিস করেন। যেসব রোগী অনবরত চলমান পেরিটনিয়েল ডায়ালাইসিস গ্রহণ করেন তারা ডায়ালাইসেট থেকে গ্লুকোজ শোষণ করে এবং তাদের অতিরিক্ত ওযন বাড়ে। শ্বেতসারই (Carbohydrate) ক্যালরীর প্রধান উৎস এবং প্রোটিনের সঙ্গে একসাথে খেতে হবে। সুতরাং খাদ্যশক্তির জন্য প্রোটিন ব্যবহৃত হবে না। অতিরিক্ত প্রোটিনযুক্ত শ্বেতসার এবং কম ইলেকট্রোলাইট সাপ্লিমেন্ট করলে বেশি পরিমাণে খাদ্যশক্তি বাড়ে।

প্রোটিন : প্রোটিন ০.৬ গ্রাম শরীরের প্রতি কেজি আদর্শ ওযনের জন্য দিলে নাইট্রোজেন ব্যালান্স ভাল হয় এবং যাদের ডায়ালাইসিস হয়নি তারা এর চেয়ে বেশি নিয়ন্ত্রণ করলে শরীর শুকিয়ে যায়। কম প্রোটিন সমৃদ্ধ খাবার (২৫ গ্রামের কম) যুক্ত এসেনসিয়াল এমাইনো এসিড এবং কিটোসিড দিলে কিডনী ফেইলুর রোগীদের নাইট্রোজেন ব্যালেন্স ভাল হয়। হিমোডায়ালাইসিসের রোগীকে ১.০ গ্রাম প্রোটিন প্রতি কেজি শরীরের ওযনের জন্য দিতে হবে, হিমোডায়ালাইসিসে ক্ষতি হওয়া প্রোটিনের ঘাটতি মেটানোর জন্য।

তেল : ক্রনিক কিডনী ফেইলুরে সাধারণত লিপিড প্রোফাইল বাড়ে। সুতরাং ট্রাইগ্লিসারাইড ও কোলেস্টেরল কম রাখতে হবে এবং পলিআনসেচুরেটেড তেল বেশি দিতে হবে।

পটাসিয়াম : অতিরিক্ত বা কম পটাসিয়াম দুটোই রোগীর জন্য খারাপ। ক্রনিক কিডনী ফেইলুরে সাধারণত পটাসিয়াম বৃদ্ধি হয়। রোগীর রক্তে এবং প্রসাবে পটাসিয়ামের মাত্রা দেখে ডায়ালাইসেটের মাত্রা নির্ধারণ করতে হবে। ডায়ালাইসিস হয়নি এমন রোগীদের ১৫০০ মিলিগ্রাম থেকে ২০০০ মিলিগ্রাম পটাসিয়াম দিতে হবে। হিমোডায়ালাইসিস রোগীকে দিতে হবে ২৭০০ মিলিগ্রাম এবং পেরিটনিয়েল ডায়ালাইসিস হ'লে ৩০০০ মিলিগ্রাম থেকে ৩৫০০ মিলিগ্রাম। প্রাণিজ প্রোটিন, অনেক ফল এবং শাক-সবজিতে পটাসিয়াম বেশি থাকে, সেগুলো বাদ দিতে হবে। অনবরত চলমান পেরিটনিয়েল ডায়ালাইসিস রোগীদের পটাসিয়াম সীমিত করার প্রয়োজন নেই।

সোডিয়াম : শরীরে রস, উচ্চরক্তচাপ এবং হার্ট ফেইলুরের কারণে লবণ নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। ডায়ালাইসিস হয়নি এমন উচ্চরক্তচাপ সম্পন্ন রোগীকে এক গ্রাম সোডিয়াম দৈনিক দেয়া যেতে পারে। তবে সোডিয়ামের অভাব থাকলে দুই গ্রাম দৈনিক দিতে হবে। হিমোডায়ালাইসিস চলছে এমন রোগীদের দৈনিক দিতে হবে ১.০ থেকে ১.৫ গ্রাম। আর পেরিটনিয়েল ডায়ালাইসিস রোগীদের ২.০ থেকে ৩.০ গ্রাম। অনবরত চলমান পেরিটনিয়েল ডায়ালাইসিস রোগীদের সোডিয়াম নিয়ন্ত্রণ করার দরকার নেই। তবে রক্তচাপ কম হ'লে সোডিয়াম দিতে হবে।

ফসফরাস : ইউরিয়া বেশি রোগীদের ক্রমান্বয়ে ফসফরাস লেবেল সেরামে বাড়তে থাকে এবং রোগীর এসিডোসিস হয়। ফসফরাস লেবেল নিয়ন্ত্রণ করার জন্য দিনে ৬০০ থেকে ১২০০ মিলিগ্রাম ফসফরাস খাদ্যে দিতে হবে। ডায়রিয়ার উৎপাদিত খাবার সীমিত করতে হবে। যেহেতু তাদের মধ্যে বেশি ফসফরাস থাকে এবং তাতে ক্যালসিয়ামের মাত্রা কমবে। অ্যালুমিনিয়াম হাইড্রোঅক্সাইড জেল প্রায়ই দেয়া হয় অন্ত্রে ফসফেটকে বন্ধন করার জন্য।

ক্যালসিয়াম : কিডনী ফেইলুরে সাধারণত ক্যালসিয়ামের মাত্রা কমে যায় এবং কিডনীর ক্ষতি হয়। সাধারণত প্রোটিন ও ফসফরাস সমৃদ্ধ খাবার সীমিত করার কারণে ক্যালসিয়ামও কমে যায়। সেরাম ক্যালসিয়াম লেবেল নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করতে হবে ও এটা সাপ্লিমেন্ট করতে হবে এবং স্বাভাবিক মাত্রায় আনতে হবে। ক্রনিক ইউরেমিক রোগীকে দিনে ১.২ গ্রাম থেকে ১.৬ গ্রাম এবং ডায়ালাইসিস রোগীকে ১.০ গ্রাম দিতে হবে।

খনিজ : শুধুমাত্র খাদ্য আয়রণ এবং ট্রেস মিনারেলস-এর চাহিদা মেটাতেই পারে না। সুতরাং খনিজ সাপ্লিমেন্ট করতে হবে। কিডনী ফেইলুরে খাওয়ার অরুচি হয়। সেক্ষেত্রে জিংকসাপ্লিমেন্ট করলে রুচির পরিবর্তন ঘটে।

ভিটামিন : ডায়ালাইসিসের সময় ভিটামিন সি এবং বি ভিটামিন শরীর থেকে বের হয়ে যায়। এই ভিটামিনগুলো কম খাওয়া হয়। কারণ কাঁচা শাক-সবজি সীমিত করা হয় এবং খাদ্য অনেক পানির মধ্যে পাক করা হয় এতে পটাসিয়ামের মাত্রা কমানোর জন্য। ফলিক এসিড এবং পাইরিডক্সিনের প্রয়োজনও বেশি হয় অন্যান্য ওষুধের বিপরীত কার্যকারিতার জন্য। ভিটামিন ডি-এর বিপাক ক্রিয়ায় ব্যাঘাত ঘটে। কারণ ফেইলুর হওয়া কিডনী ভিটামিন ডি-কে একটিভ ফর্মে নিতে পারে না। সুতরাং সকল ভিটামিন সাপ্লিমেন্ট করতে হবে।

পানি : ক্রনিক কিডনী ফেইলুরে পানি গ্রহণ নিবিড়ভাবে মনিটর করতে হবে। যদি উচ্চরক্তচাপ বা ইডিমা না থাকে, তবে দৈনিক ৫০০ মিলিলিটার যোগ যে পরিমাণ প্রস্রাব হয় তা দিতে হবে। দেড় থেকে তিন লিটার পর্যন্ত দেয়া যেতে পারে। যদি প্রস্রাব একেবারেই না হয় বা কম হয় তাহ'লে পানি দেড় লিটারের নিচে সীমিত রাখতে হবে। ডায়ালাইসিস হওয়া রোগীর ওযন দৈনিক এক পাউন্ড পর্যন্ত বাড়তে দেয়া যেতে পারে। অনবরত পেরিটোনিয়েল ডায়ালাইসিস নিয়ে চলনশীল রোগীর পানি সীমিত করার প্রয়োজন নেই। কারণ তারা পানির পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করতে পারে ডায়ালাইসেট থেকে।

॥ সংকলিত ॥

ক্ষেত-খামার

বিদ্যুৎবিহীন হিমাগারে শাক-সবজি ও ফলমূল সংরক্ষণ

বাংলাদেশের উত্তরোত্তর উন্নয়নের দিকে এগিয়ে চলার একমাত্র প্রতিবন্ধকতা হ'ল দেশে বিদ্যুৎ ঘাটতি। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার দৈনন্দিন খাদ্য চাহিদা মেটাতে গিয়ে কখনও সেচনির্ভর ধান উৎপাদন অথবা কখনও উৎপাদিত ফসল, শাক-সবজি, ফলমূল ইত্যাদি সংরক্ষণে পর্যাপ্ত বিদ্যুৎ সরবরাহ করতে গিয়ে প্রতিনিয়তই হিমশিম খেতে হচ্ছে সরকারকে। ফলে নষ্ট হচ্ছে জমির ফসল, পচে যাচ্ছে হিমাগারে সংরক্ষিত সবজি বা অন্যান্য ফলমূল। অন্যদিকে পর্যাপ্ত হিমাগার সঙ্কট তো রয়েছেই। এ সমস্যার সমাধানে স্বল্প ব্যয়ে এবং সহজে বিদ্যুৎ বিহীন হিমাগার তৈরির এক প্রযুক্তি উদ্ভাবন করেছেন বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের (বাকৃবি) কৃষি প্রকৌশল ও কারিগরি অনুষদের কৃষি শক্তি এবং যন্ত্রবিভাগের সহকারী অধ্যাপক মুহাম্মাদ পারভেজ ইসলাম। বহুদিনের চিন্তা থেকে তিনি এ প্রযুক্তি উদ্ভাবনে সফল হন।

এ গবেষণা কাজ হয় ঢাকার অদূরে গাযীপুরের ভবানীপুরে অবস্থিত একটি নার্সারী ও হর্টিকালচার সেন্টারে। পরীক্ষামূলকভাবে সেখানে একটি শিতলীকরণ চেম্বার তৈরি করা হয়। দীর্ঘদিন পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর গ্রীষ্মকালীন শাক-সবজি ও ফলের সংরক্ষণে আশানুরূপ ফল পাওয়া যায়।

হিমাগার তৈরির পদ্ধতি : প্রথমে ৯০ সে.মি. মাটি গর্ত করে ইট দিয়ে আয়তকার (দৈর্ঘ্য ১৬৫ সে.মি. ও প্রস্থ ১১৫ সে.মি.) একটি মেঝে তৈরি করতে হবে। মেঝের চারপাশে দ্বিস্তর বিশিষ্ট দু'টি দেয়াল তৈরি করতে হবে, যেন তৈরিকৃত স্তর দু'টির মধ্যে ৫ ইঞ্চি পরিমাণ ফাঁকা জায়গা থাকে। ফাঁকা স্থানটির নীচের অংশে প্রথমে ছোট ছোট পাথরের টুকরা ও মাটি দিয়ে ভরাট করতে হবে। পরে অবশিষ্ট ফাঁকা স্থানটুকু নদীর ভেজা বালু দিয়ে পরিপূর্ণ করে দিতে হবে। কক্ষটি ঢেকে রাখার জন্য বাঁশ দিয়ে একটি ঢাকনা বানাতে হবে। এরপর শুকনো খড় অথবা গোলপাতা দিয়ে কক্ষটির চারপাশে একটি দোচালা ছাউনি বানাতে হবে, যাতে সূর্যের সরাসরি আলো বা তাপ কক্ষটির ওপর পড়তে না পারে। এরপর কক্ষটি ঠাণ্ডা রাখতে ঘরের দুই দেয়ালের মাঝে রাখা বালিতে ফোঁটা ফোঁটা আকারে নির্দিষ্ট পরিমাণে পানি দিতে হবে। এজন্য কক্ষের পাশেই একটু উঁচু স্থানে একটি ঢাকনাযুক্ত পানির ট্যাংক বা ড্রাম রাখতে হবে। ঐ ট্যাংক বা ড্রামের সঙ্গে সংযুক্ত পাইপের মাধ্যমে নির্দিষ্ট সময় ধরে ঠাণ্ডা পানি সরবরাহ করতে হয়, যাতে দুই দেয়ালের মাঝের বালি সর্বদা ভিজা থাকে। ফলে দুই দেয়ালের মাঝে রাখা ঠাণ্ডা বালি বাইরের গরম তাপমাত্রাকে যেমন ভেতরে যেতে দেয় না, তেমনি ভেতরের ঠাণ্ডা তাপমাত্রাকে বাইরে আসতে বাধা দেয়। এ পদ্ধতিতে তৈরিকৃত কক্ষের ভেতরের ও বাইরের তাপমাত্রার মধ্যে প্রায় ১০০ সে.-এর মতো পার্থক্য থাকে এবং কক্ষের মধ্যে অধিক আর্দ্রতার জন্য শাক-সবজি ও ফলমূল দীর্ঘদিন সতেজ থাকে। এ ধরনের একটি শিতলীকরণ চেম্বার তৈরি করতে প্রায় ৬ হাযার টাকার মতো লাগে এবং এটাতে ২০০ কেজির বেশি শাক-সবজি ও ফলমূল সংরক্ষণ করে রাখা যায়। এছাড়া প্রতিটি তৈরিকৃত কক্ষের স্থায়িত্বকাল কমপক্ষে পাঁচ বছর।

এ প্রযুক্তি ব্যবহার করে গ্রীষ্মকালে ঢেঁড়শ, বেগুন, মরিচ, পটোল, টমেটো, করলা ও সাজনা সংরক্ষণের মেয়াদ ৮দিন থেকে ১০ দিন পর্যন্ত বাড়ানো সম্ভব। শীতকালে এ সময়কাল প্রায় দ্বিগুণ হয়। সম্পূর্ণ বিদ্যুৎবিহীন হিমাগার তৈরির প্রযুক্তটি বাংলাদেশের গ্রামীণ কৃষক পর্যায়ে এবং ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের জন্য অত্যন্ত উপযোগী হবে।

গাভী পালন করে স্বাবলম্বী

পাবনার সাঁথিয়া পৌরসভাধীন বোয়াইলমারী গ্রামের মৃত রওশন আলীর ছেলে উদ্যমী বেকার যুবক বেলায়েত হোসাইন গাভী পালন করে হয়েছেন স্বাবলম্বী। ১৯৮৮ সালে এসএসসি পাস করে পারিবারিক সমস্যার কারণে লেখাপড়া করতে পারেননি। শিক্ষাগত যোগ্যতা কম থাকায় দীর্ঘদিন বেকার থাকা বেলায়েত বেকারত্বের অভিশাপ থেকে রক্ষা পেতে ১৯৯৮ সালে একটি গাভী ও একটি বকনা বাছুর কিনে মাত্র ১৪ হাযার টাকা পুঁজি দিয়ে নিজের বাড়িতে গাভী পালন শুরু করেন। বর্তমানে তার ফিজিয়াম, শাহিয়াল ও জার্সি জাতের ৯টি গাভী, দু'টি ষাঁড়, ৪টি বকনা ও ৯টি বাছুরসহ মোট ২৪টি গরু আছে। যার বর্তমান বাজারমূল্য প্রায় ২০ লাখ টাকা। তার গাভী থেকে প্রতিদিন প্রায় ৯০ লিটার দুধ হয় এবং প্রতিদিন আয় হয় প্রায় ৩ হাযার টাকা। খেয়ে-পরে সংসার চালিয়ে খরচ বাদে বছর শেষে তার সঞ্চয় হয় দু'লক্ষাধিক টাকা। এছাড়া গরুর গোবর থেকে তৈরী জৈবসার রাসায়নিক সারের পরিবর্তে জমিতে দিয়ে ভাল ফসলও উৎপাদন করছেন। গোবর থেকে বায়োগ্যাস তৈরী করে রান্নার কাজে জ্বালানি হিসাবে ব্যবহার করছেন এবং বিদ্যুতের অভাবও পুষিয়ে নিচ্ছেন এ থেকে। তিনি ২০০৮-০৯ অর্থবছরে জাতীয় শ্রেষ্ঠ সমবায়ী হিসাবে স্বর্ণপদক ও ১৫ হাযার টাকা পুরস্কার পান। তার সফলতায় এলাকার অনেক যুবকই গরুর খামার করেছেন।

নার্সারী খুলেছে ভাগ্যের দুয়ার

গাইবান্ধার সাদুল্যাপুর উপযেলার উত্তর ফরিদপুর গ্রামের ইসমাঈল হোসাইন বাদশা নার্সারী করে ভাগ্যের চাকা ঘুরিয়েছেন। ১৯৮৬ সালে পরীক্ষামূলকভাবে ১০ শতাংশ জমিতে নার্সারী করে ফলদ, বনজ ও ওষুধি চারা রোপণ করেন। এর মাধ্যমেই তার ভাগ্য পরিবর্তনের যাত্রা শুরু হয়। এখন তিনি ৬ বিঘা জমির উপর একটি বিশাল আকারের নার্সারী স্থাপন করেছেন। তার নার্সারীতে ফলদ, বনজ ও ওষুধিসহ সব ধরনের গাছের প্রায় ৩শ' প্রজাতির ১৩ লাখেরও অধিক চারা রয়েছে। তার নার্সারীতে ফল জাতীয় গাছের চারার মধ্যে রয়েছে- আম, কাঁঠাল, লিচু, সবেদা, পেয়ারা, ডালিম, বেল, জলপাই, কমলা, লেবু, মালটা, তেতুলসহ ২শ' প্রজাতি। অপরদিকে বনজ বৃক্ষের মধ্যে রয়েছে মেহগনি, লম্বু, রেইনটি, বেলজিয়াম, নিম, সেগুনসহ ১শ' প্রজাতি। এছাড়া তার নার্সারীতে বাসক, আমলকি, বহেরা, বাসিক, খবচ, তুলসী, থানকুনি, গন্ধক ইত্যাদি ঔষধী বৃক্ষের চারা পাওয়া যায়। প্রতিবছর মৌসুমে ১ থেকে দেড় লাখ টাকা খরচ করে ৩ থেকে সাড়ে ৩ লাখ টাকা আয় আসে। এই দিয়ে তিনি সচ্ছল জীবন যাপন করছেন। অনেকে তার নার্সারী থেকে সরাসরি চারা সংগ্রহ করে নিয়ে যায়। আবার নিজস্ব লোক দিয়েও বিভিন্ন হাট-বাজার এবং শহরে চারা বিক্রি করা হয়। উন্নত জাতের চারা উৎপাদনের জন্য এই নার্সারী চারার যথেষ্ট কদর রয়েছে। ইসমাঈল হোসাইন বাদশা ২০১১ সালে 'বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পদক' পান। এছাড়াও তিনি সার্টিফিকেট, নগদ অর্থসহ অনেক পুরস্কার পেয়েছেন। তার নার্সারীতে ১৫-২০ জন পুরুষ ও নারী শ্রমিক কাজ করে।

কবিতা

ভুয়া মুসলিম

-আমীরুল ইসলাম মাষ্টার
ভায়া লক্ষ্মীপুর, চারঘাট, রাজশাহী।

কে বলে তোমায় মুসলিম?
কে করে তোমায় মহৎ জানিয়া
কুর্নিশ তাসলীম।
কে দেয় তোমায় শ্রেষ্ঠ আসন
কে শোনে তোমার মিথ্যা ভাষণ
ছলনা ধোঁকার কথা
পরিচয় তব রহিয়াছে ঢের
সমাজের যথাতথা।
ভাল মানুষের পোশাকে ঢাকিয়া
নোংরা নাপাক দেহ
কোন কালে যুগে ভাল হইয়াছে
দেখেছে কখনো কেহ।
মাকালের গায়ে লাল টুকটুক
নয়ন ভোলানো দেখতে কি সুখ
ভিতরে ভাঙ্গিলে কুকুরের মল
কুৎসিৎ বিভৎস কাল
আবরণে ঢেঁকে মন্দ জিনিষ
হয় না কখনো ভাল।
মসজিদে তুমি কর না গমন
পড় না ছালাত কভু
কর না পালন বলিয়াছে যাহা
দ্বীন দুনিয়ার প্রভু।
রামাযান মাসে পেট পুরে খেয়ে
জুয়ার আড্ডায় যাও
কখনো আবার নেশা পান করে
মদ্য মাতাল হও।
দরগা পূজার পূজারী তুমি
পীরের চরম ভক্ত
এখনও তুমি অহংকারে বল
আমার ঈমান শক্ত।
ছালাত, ছিয়ামে চরম ফাঁকি
হজ্জ ও যাকাতে প্রহসন দেখি
পর্দার কথা বলিলে তুমি
মুখ ভ্যাংচাইয়া বল
বর্বর যুগের বর্বরতা নর্দমায় ছুড়ে ফেল।
পড়নি কুরআন নবীর হাদীছ
ভবের শিক্ষা জ্ঞান-বিজ্ঞান
অর্জন করেছ মেলা।
বিরান তোমার অমূল্য জীবন
উজাড় গৃহের ন্যায়
মূল্যহীন ঐ শিক্ষা-দীক্ষা
আল্লাহ্‌র বিধানে কয়।
মুসলিম বলিয়া মিথ্যা এ দাবী
ইহকালে করে যারা
তোমাদের মত ভুয়া মুসলিম
পরকালে খাবে ধরা।

***

গ্রীষ্মের আম বাগান

-এম. ওবায়দুল্লাহ শাহিদ
ভায়া লক্ষ্মীপুর, চারঘাট, রাজশাহী।

বৈশাখ শেষে ঘ্রাণ ছুটেছে
রমরমা তাই আমের বন
দক্ষিণ মলয় শনশনে বয়
লাগতে গায়ে জুড়ায় তন।
ফজলী লখনা খির্সাপাত
আমের বাগান করছে মাত
বউ ভুলানী ভুলায় বধু
আটকে সে দেয় সবার চোখ।
গোপাল ভোগের মিষ্টি রসে
ঘিরে আসে স্বপ্নলোক
তোতাপরি হীমসাগর
ইবরাহীম খাস রঙঅম্বর
চিনির দানা হাতছানি দেয়
ডাকল মোরে আর সবাই।
কার ডাকে যাই সবুজ মাঠে
চলতে যেন পথ হারাই।

***

উপহার

-এনামুল হক মুজাহিদ
মাহমূদপুর, ভাড়ুখালী, সাতক্ষীরা।

ঐ শোনা যায় কার আহ্বান
কে ডাকে ঐ দরাজ যবান!
কুহেলী রাতের তমসাভেদী
যুবজাহেলিয়াতের গাত্রছেদী,
আসমানসম অনাচাররোধে
হইয়াছ আগুয়ান?
কে তুমি ডাক দরাজ যবান!!
শত যুলুমের ইতিকথা পিছে ছাড়ি
আত্মবিভক্তির পূর্ণ ষোলআনা আড়ি,
হতাশ-নিরাশ করেনিক তব প্রাণ
কু-আশা নাশে করেছ বরং সত্যের অভিযান।

***

সোনামণিদের পাতা

গত সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (শিক্ষা বিষয়ক)-এর সঠিক উত্তর

১। স্যার পি.জে. হার্টস। ২। স্যার এ.এফ. রহমান।
৩। মাগুরা। ৪। ৭টি।
৫। সিরাজগঞ্জ (৭ম, ১০ মে ২০০৩)।
৬। ১৯৯০ সালের জানুয়ারী মাসে।

গত সংখ্যার মেধা পরীক্ষা (ধাঁধা)-এর সঠিক উত্তর

১। বই ২। নৌকা, লঞ্চ ৩। রেললাইন
৪। কলস ৫। কলম।

চলতি সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (গণিত বিষয়ক)

১। দুই হাযার পাখি এক মণ ধান খায়, প্রতিটি পাখি কতটুকু পায়?

২। কোন পাত্রে ২৫ ও ১০ পয়সার ১২০টি মুদ্রা আছে। যার সমষ্টি ২৭ টাকা। কোন্ প্রকার মুদ্রার সংখ্যা কত?

৩। শ্রেণীতে যতজন ছাত্র-ছাত্রী প্রত্যেকে তত পয়সার চেয়ে ৪০ পয়সা বেশি করে দেওয়ায় ৬০ টাকা উঠল। ঐ শ্রেণীতে কতজন ছাত্র-ছাত্রী আছে?

৪। প্রতি বেঞ্চে ৪ জন করে বসলে ৩টি বেঞ্চ খালি থাকে, আবার ৩ জন করে বসলে ৬ জনকে দাঁড়িয়ে থাকতে হয় ঐ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রী ও বেঞ্চ সংখ্যা কত?

৫। ১-১০০-এর মধ্যে কোন্ সংখ্যাটিকে উল্টালে পূর্ব ও পরের সংখ্যাটির পার্থক্য সবচেয়ে বেশি হবে এবং পার্থক্য কত?

সংগ্রহে : মুহাম্মাদ বাশীর আল-হেলাল
রামপুর, বিরল, দিনাজপুর।

চলতি সংখ্যার মেধা পরীক্ষা (ধাঁধা)

১। তোমার আমার একই রং
একই মোদের নাম,
জন্মেছি দু'বার বাপ-মা ছাড়া,
একই মোদের কাম।

২। গাছ নেই আছে পাতা
মুখ নেই বলে কথা।

৩। কোন্ সিন্দুকের চাবি নাই
কাটা ছাড়া উপায় নাই।

৪। গাছের উপর একটি ফল
ফলের উপর গাছ
কাটলে নামে রসের ঢল
উত্তর দাও আজ।

সংগ্রহে : আহমাদ সাইয়িদ আল-আশিক
নওদাপাড়া বাজার, রাজশাহী।

সোনামণি প্রশিক্ষণ

দর্শনপাড়া, মোহনপুর, রাজশাহী ২৫ ফেব্রুয়ারী শুক্রবার : অদ্য সকাল ৭-টায় দর্শনপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে' রাজশাহী-উত্তর সাংগঠনিক যেলার সভাপতি আফাযুদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি কেন্দ্রীয় পরিচালক ইমামুদ্দীন। প্রশিক্ষণ শেষে অত্র শাখা পুনর্গঠন করা হয়।

গাংজোয়ার, নওগাঁ, ১১ মার্চ শুক্রবার : অদ্য বাদ যোহর গাংজোয়ার নূরানী হাফেযিয়া মাদরাসায় এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' নওগাঁ যেলার সভাপতি মাস্টার আনিছুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি কেন্দ্রীয় পরিচালক ইমামুদ্দীন। প্রশিক্ষণে স্বাগত ভাষণ দেন অত্র মাদরাসার শিক্ষক হাফেয আবু কাওছার। প্রশিক্ষণ শেষে সোনামণি শাখা পুনর্গঠন করা হয়।

ছোট্টমণি

জাদীদা
জাগীর হোসেন একাডেমী, পাবনা

আমাদের বাড়ীতে এক ছোট্টমণি আছে
সারাদিন বায়না ধরে সে মামণির কাছে।
ভাত রাঁধলে খাবে না সে পোলাও দেওয়া চাই
সেটাও তাকে দেওয়া হ'লে আরেক দিকে ধায়।
স্বভাব যে তার খুবই লাজুক, নেই কোন ঝুটঝাট
ছোট্টমণি বায়নার জন্য মাঝে মাঝে মারে হাঁক।
নেই কোন তার হানাহানি নেই কোন উৎপাত
হাযার বায়না ধরলেও সে খায় শুধু দুধ ভাত।
লাগলে বাড়ীর কারো সাথে একটু ঝগড়া-ঝাটি
তার চেহারার কার্টুন এঁকে ভাঙ্গে যে তার আড়ি।

***

স্বদেশ-বিদেশ

স্বদেশ

সম্পদে নারী-পুরুষের সমান অধিকার রেখে নারী উন্নয়ন নীতি মন্ত্রীসভায় অনুমোদন

উত্তরাধিকার সম্পত্তিতে নারীর সমঅধিকারের বিধান রেখে জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিমালার খসড়া অনুমোদন দিয়েছে মন্ত্রীসভা। গত ৭ মার্চ সচিবালয়ে মন্ত্রীসভার বৈঠকে এ অনুমোদন দেওয়া হয়। নতুন এ নীতিমালার ১৭ (৫) ধারায় বলা হয়েছে, 'স্থানীয় বা রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে কোন ধর্মের, কোন অনুশাসনের ভুল ব্যাখ্যার ভিত্তিতে নারীস্বার্থের পরিপন্থী এবং প্রচলিত আইন বিরোধী কোন বক্তব্য প্রদান বা অনুরূপ কাজ বা কোন উদ্যোগ গ্রহণ না করা'। ২৩ (৫) ধারায় বলা হয়েছে, 'সম্পদ, কর্মসংস্থান, বাজার ও ব্যবসায় নারীকে সমান সুযোগ ও অংশীদারিত্ব দেয়া'। ২৫ (২) ধারায় বলা হয়েছে, 'উপার্জন, উত্তরাধিকার, ঋণ, ভূমি এবং বাজার ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে অর্জিত সম্পদের ক্ষেত্রে নারীর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণের অধিকার প্রদান করা'। ১৬ (২) ধারায় বলা হয়েছে, 'রাজনীতি, প্রশাসন ও অন্যান্য কর্মক্ষেত্রে, আর্থ-সামাজিক কর্মকাণ্ড, শিক্ষা, সংস্কৃতি ও ক্রীড়া এবং পারিবারিক জীবনের সর্বত্র নারী-পুরুষের সমানাধিকার প্রতিষ্ঠা করা'। ১৬ (১) ধারায় বলা হয়েছে, 'বাংলাদেশ সংবিধানের আলোকে রাষ্ট্রীয় ও গণজীবনের সকল ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সমান অধিকার প্রতিষ্ঠা করা'।

দেশের ওলামায়ে কেরাম ও বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ২৩ (৫) ধারায় বর্ণিত 'সম্পদ' বলতে নারীর উত্তরাধিকার সম্পদও অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। এক্ষেত্রেও ২৫ (২) ধারা প্রযোজ্য হতে পারে। তাছাড়া নারীরা সম্পদের অংশীদারিত্ব কেবল উত্তরাধিকার সম্পদ থেকেই পেয়ে থাকে। উপরোক্ত দু'টি ধারা (২৩.৫ ও ২৫.২) ভবিষ্যতে উত্তরাধিকার সম্পত্তিতে নারী-পুরুষের সমতাকে অনিবার্য করে তুলবে। এভাবে ভাষার মারপ্যাচের মাধ্যমে 'উত্তরাধিকার' কথাটি সরাসরি উল্লেখ না থাকলেও সংশ্লিষ্ট কয়েকটি ধারায় গণজীবনের সর্বক্ষেত্রে সমঅধিকার প্রতিষ্ঠা এবং উত্তরাধিকার সম্পত্তিতে সমঅংশীদারের বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এছাড়া নারীর প্রতি সব ধরনের বৈষম্য বিলোপ (সিডও) সনদ বাস্তবায়নসহ ১৯৯৭ সালের প্রায় সব বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে নতুন নীতিমালায়।

চার পার্বত্য যেলায় খৃষ্টান বানানোর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ৮ এনজিও

একটি প্রভাবশালী আন্তর্জাতিক চক্র দেশের পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের ৪টি যেলায় বাঙ্গালীসহ বিভিন্ন উপজাতীয় জনগোষ্ঠীকে খৃষ্ট ধর্মে ধর্মান্তরিত করার অপচেষ্টায় লিপ্ত রয়েছে। ৮টি এনজিও'র মাধ্যমে পার্বত্য অঞ্চলে শত শত কোটি টাকা ব্যয় করার পাশাপাশি সুদূরপ্রসারী ষড়যন্ত্রের নেপথ্যে মদদ দিচ্ছে ঢাকাস্থ মার্কিন দূতাবাস ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের বেশ কয়েকজন কর্মকর্তা। বাংলাদেশের পাশাপাশি ভারতের কিছু রাজ্য ও মিয়ানমারের কিছু প্রদেশেও একই কায়দায় সক্রিয় রয়েছে ঐ আন্তর্জাতিক চক্রটি। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপট ও মার্কিন দূতাবাসের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে সম্প্রতি পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল থেকে এসব বিষয় তুলে ধরে সরকারের উচ্চ পর্যায়ে একটি প্রতিবেদন দাখিল করা হয়েছে।

জানা গেছে, খাগড়াছড়ি যেলায় মার্কিন চক্রের সাথে হাত মিলিয়ে ধর্মান্তরিত করাসহ অন্যান্য কাজে জড়িত এনজিও'র মধ্যে রয়েছে প্রেরিত দূতং সাধু যোহনের 'ধর্মপল্লী', 'টাউন ব্যাপ্টিষ্ট চার্চ'। বান্দরবান যেলায় রয়েছে 'গ্রাউস', 'কৈলানিয়া' ও 'তৈমু'। রাঙ্গামাটি যেলায় রয়েছে 'ক্যাথলিক মিশন চার্চ', 'খৃষ্টান এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ', 'ইউনাইটেড পোস্ট কোষ্টাল চার্চ অব বাংলাদেশ'। পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে সরকারের উচ্চ পর্যায়ে পাঠানো স্থানীয় প্রশাসনের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, সেভেন ডে এডভেনটিষ্ট স্কুল (প্রটেস্ট্যান্ট) রাঙ্গামাটি যেলার বাঙ্গালহালিয়া, রাজস্থলী উপযেলায় কাজ করছে। ঐ স্কুলে ৪৭৫ জন ছাত্র-ছাত্রী রয়েছে। এদের অধিকাংশই অতি দরিদ্র উপজাতীয়। এখানে বিনামূল্যে লেখাপড়া ও থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে। অতি দরিদ্রদের এসব সুযোগ-সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে বৌদ্ধসহ অন্যান্য ধর্ম থেকে খৃষ্টান ধর্মে ধর্মান্তরিত করা হয়ে থাকে।

ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দল থাকছে

সংবিধান সংশোধনের ফলে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী সহ নিবন্ধিত কোন ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ হবে না। তবে তাদের সংবিধানের আদর্শ ও উদ্দেশ্য মেনেই রাজনীতি করতে হবে এবং তারা ধর্মকে অপব্যবহার করে সাম্প্রদায়িকতা সৃষ্টি করতে পারবে না। সংবিধানের ৩৮ অনুচ্ছেদে এ সংক্রান্ত শর্ত সংযোজনের ব্যাপারে ঐকমত্যে পৌঁছেছে সংবিধান সংশোধনে গঠিত বিশেষ কমিটি। গত ১৬ মার্চ জাতীয় সংসদ ভবনে ১১তম বৈঠক শেষে কমিটির মুখপাত্র ও কো-চেয়ারম্যান সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত এ তথ্য জানান। প্রসঙ্গত, সংবিধানের ৩৮ অনুচ্ছেদে উল্লেখ রয়েছে, 'জনশৃঙ্খলা ও নৈতিকতার স্বার্থে আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তিসঙ্গত বাধা-নিষেধ সাপেক্ষে সমিতি বা সংঘ গঠন করার অধিকার প্রত্যেক নাগরিকের থাকবে'।

২০১০ সালে বিচারবহির্ভূত হত্যার শিকার ১২৭ জন

মানবাধিকার সংগঠন 'অধিকার'-এর প্রতিবেদন থেকে জানা গেছে, ২০১০ সালে দেশে ১২৭ জন বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছে। এর মধ্যে ২০১০ সালের জানুয়ারীতে ৫, ফেব্রুয়ারীতে ১২, মার্চে ৭, এপ্রিলে ৯, মে মাসে ১৮, জুনে ১১, জুলাইয়ে ১০, আগষ্টে ৯, সেপ্টেম্বরে ১০, অক্টোবরে ১১, নভেম্বরে ১৫ ও ডিসেম্বরে ১০ জন নাগরিক বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছে। অধিকারের তথ্য অনুযায়ী এর আগের বছর ২০০৯ সালে বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছিল মোট ১৫৪ জন। চলতি বছরের ফেব্রুয়ারীতে বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছে ১৭ জন। এর আগের মাসে গত জানুয়ারীতে ৭ জন বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছে।

বিদেশ

স্মরণকালের ভয়াবহ ভূমিকম্প ও সুনামীতে লণ্ডভণ্ড জাপান

স্মরণকালের ভয়াবহ ভূমিকম্প ও সুনামীতে শিল্পোন্নত দেশ জাপানের উত্তর-পূর্বাঞ্চল ধ্বংস্তূপের কৃষ্ণ গহ্বরে পরিণত হয়েছে। গত ১১ মার্চ শুক্রবার স্থানীয় সময় ২-টা ৪৬ মিনিটে ৮ দশমিক ৯ মাত্রার ভয়াবহ ভূমিকম্প এবং তার অভিঘাতে সৃষ্ট ৩৩ ফুট উচ্চতার সুনামী বিপর্যস্ত করে ফেলেছে রাজধানী টোকিওসহ জাপানের বিস্তীর্ণ অঞ্চলকে। এ ভূমিকম্পে টোকিও নগরী ২০ মিনিট ধরে কেঁপেছে। ভূমিকম্পের উৎপত্তিস্থল ছিল রাজধানী টোকিও থেকে ২৫০ মাইল দূরে এবং সমুদ্রের ৩২ কিলোমিটার গভীরে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ১৪০ বছরের মধ্যে জাপানে আঘাত হানা এটিই হচ্ছে সবচেয়ে ভয়াবহ ভূমিকম্প। এর আগে সবচেয়ে ভয়াবহ ৭ দশমিক ৯ মাত্রার ভূমিকম্প দেশটিতে আঘাত হেনেছিল ১৯২৩ সালে, যার ফলে ১ লাখ ৪০ হাযার মানুষ নিহত হয়েছিল।

উল্লিখিত ভূমিকম্প ও সুনামির ফলে জাপানে ২০ হাযারের অধিক মানুষ নিহত হয়েছে। নিহতের সংখ্যা ক্রমেই বাড়ছে। নিখোঁজ রয়েছে ২০ হাযারের বেশি মানুষ। এক লাখ শিশু গৃহহীন হয়েছে। জনপদের পর জনপদ লণ্ডভণ্ড হয়ে মাটির সাথে মিশে গেছে। মিয়ামি অঞ্চলের একটি গ্রামের ১০ হাযার অধিবাসীর কেউ বেঁচে নেই। মৎস্য বন্দর মিনামি নাস রিকিচোর ১৭ হাযার বাসিন্দার মধ্যে ১০ হাযারকেই খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। নগরীর প্রায় ৬ কিলোমিটার ভূভাগ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে সুনামির আঘাতে। উত্তর উপকূলের পৌনে ১ লাখ লোকের শহর কেসেনুমার বিশাল এলাকা এখনও পানির নিচে। সুনামির প্রচণ্ডতায় খড়কুটোর মতো ভেসে গেছে নৌযান, গাড়ি এমনকি ঘরবাড়ি পর্যন্ত। সমুদ্রের বড় বড় জাহাজগুলো স্থলভাগে উঠে এসেছে। এমনকি তিন তলা বাড়ির ছাদের ওপর পর্যন্ত উঠে আসার ঘটনা ঘটেছে। ভূমিকম্পের তিন দিন আগেও জাপানের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের যে শহরগুলো ছিল কর্মচঞ্চল জনপদ, এখন সেগুলো সব ভূতুড়ে শহর। আল্লাহ্র গযবের নীরব সাক্ষী। ধ্বংসস্তূপের মধ্যে লাশের পাশেই আহত ও বিপন্নদের আহাজারি জাপানের আকাশ-বাতাস ভারী করে তুলেছে। এর মধ্যে প্রচণ্ড শীত, তুষারপাত ও ফুকুশিমা দাইচি পরমাণু চুল্লির বিস্ফোরণে ছড়িয়ে পড়া তেজস্ক্রিয়তা গোদের ওপর বিষফোড়া রূপে দেখা দিয়েছে। পানি, দুধ, শাক-সবজি ও পানিতে তেজস্ক্রিয়তা দেখা দেয়ায় মানুষের মাঝে ক্যান্সারের আতংক ছড়িয়ে পড়েছে। তেজস্ক্রিয়তার কারণে ফুকুশিমা এলাকার সব ধরনের খাদ্যদ্রব্য বিক্রি বন্ধের ঘোষণা দিয়েছে সরকার। খাদ্য, পানীয়, আশ্রয়স্থল ও বিদ্যুতের অভাবে জনজীবন হয়ে উঠেছে দুর্বিষহ। সর্বশেষ খবরে জানা গেছে, ফুকুশিমা পরমাণু বিদ্যুৎকেন্দ্রের ক্ষতিগ্রস্ত ১নম্বর চুল্লির কন্ট্রোলরুমে বিদ্যুৎ সংযোগ পুনঃস্থাপন করতে সক্ষম হয়েছেন প্রকৌশলীরা। উল্লেখ্য, ভূমিকম্পে ফুকুশিমার ছয়টি পরমাণু চুল্লির তিনটিতে বিস্ফোরণ ঘটে এবং একটিতে আগুন ধরে যায়।

মুসলিম জাহান

চিলি, ফিলিপাইন, অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশে। এদিকে গত ২২ মার্চ জাপানের হোলশুর পূর্ব উপকূলে স্থানীয় সময় বেলা সাড়ে ১২-টায় রিখটার স্কেলে ৫ দশমিক ৯ মাত্রার ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে। এটির কেন্দ্র ১১ দশমিক ৪০ কিলোমিটার গভীরে ছিল।

ক্ষয়ক্ষতি : আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর মতে এ দুর্যোগে ক্ষতির পরিমাণ ১০ হাযার কোটি পাউন্ড ছাড়িয়ে যাবে। এদিকে জাপান সরকার বলছে, ক্ষতির পরিমাণ দাঁড়াতে পারে ২৫ ট্রিলিয়ন ইয়েন। ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্ত বাড়িঘর, কলকারখানা, রাস্তাঘাট ও সেতু নির্মাণ বা পুনর্গঠনে আগামী তিন অর্থবছরে ব্যয় হবে ১৬ থেকে ২৫ ট্রিলিয়ন ইয়েন।

বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা : প্রশান্ত মহাসাগরের তলদেশে দু'টি প্লেটের মধ্যে প্রতিনিয়ত প্রতিযোগিতা চলছিল। প্রশান্ত মহাসাগরীয় প্লেটটি ঢুকে যাওয়ার চেষ্টা করছিল ইউরেশীয় প্লেটের নীচে। ইউরেশীয় প্লেট তাতে বাধা দিচ্ছিল। তার জোরে সমুদ্রের তলদেশে ঐ অংশে তৈরী হচ্ছিল শক্তি। এক সময় সেই শক্তি এতটাই জমে গেল যে, তাকে আর ধরে রাখা গেল না। সমুদ্রের তলদেশে সেই সঞ্চিত শক্তি একসঙ্গে নির্গত হ'ল, যা প্রশান্ত মহাসাগরীয় প্লেটটিকে এক ধাক্কায় ঢুকিয়ে দিল ইউরেশীয় প্লেটের তলায়। সমুদ্রের তলদেশে বাড়ল ফাটল। সৃষ্টি হ'ল রিখটার স্কেলে ৮.৯ তীব্রতার প্রচণ্ড ভূমিকম্প। সমুদ্র তলদেশে নির্গত বিপুল পরিমাণ শক্তি সমুদ্রের জলকে ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে নীচ থেকে উপরে তুলে আনল। তীব্রগতিতে বিপুল শক্তি নিয়ে সেই জল আছড়ে পড়ল জাপানের উত্তর-পূর্ব উপকূলে। এটাই সুনামী। ভূবিজ্ঞানীদের মতে, ঐ ভূপ্রাকৃতিক ক্রিয়ায় সমুদ্রের তলায় যে শক্তি নির্গত হয় তার তীব্রতা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জাপানের হিরোশিমা শহরে ফেলা পরমাণু বোমার শক্তির তিন কোটি গুণ বেশী।

পৃথিবীর অক্ষরেখা ১০ সেন্টিমিটার সরে গেছে; বেড়ে গেছে পৃথিবীর ঘূর্ণনের বেগ : জাপানে স্মরণকালের ভয়াবহ ভূমিকম্পে পৃথিবীর অক্ষরেখা প্রায় ১০ সেন্টিমিটার সরে গেছে। এদিকে নাসার গবেষণা মতে, জাপানে সুনামির পর থেকে পৃথিবীর আহ্নিক গতির বেগ ১.৮ মাইক্রোসেকেন্ড বেড়ে গেছে, যা এক সেকেন্ডের ২০ লাখ ভাগের এক ভাগ। একটি আহ্নিক গতির বেগ সম্পূর্ণ হয় ৮৬ হাযার ৪০০ সেকেন্ডে। দক্ষিণ কোরিয়ার মহাকাশ বিজ্ঞান সংস্থার বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন, জাপানের ভূমিকম্পে কোরীয় উপদ্বীপ পূর্বদিকে পাঁচ সেন্টিমিটারের বেশি সরে গেছে আর জাপান আরো পূর্বদিকে প্রায় ২ দশমিক চার মিটার সরে গেছে। ফলে দুই দেশের মধ্যকার দূরত্ব দুই মিটারের বেশি বেড়ে গেছে।

নয়দিন পর জীবিত উদ্ধার : ভূমিকম্প ও সুনামীবিধ্বস্ত জাপানে একটি বাড়ির ধ্বংসস্তূপের নীচে চাপা পড়ে থাকার নয় দিন পর জিন অ্যাবে নামে এক কিশোর ও তার দাদী সুমি অ্যাবেকে গত ২০ মার্চ তাঁদের কাঠের বাড়ির দোতলার রান্নাঘর থেকে উদ্ধার করা হয়। ভূমিকম্পে বাড়িটি বিধ্বস্ত হয়। ধ্বংসস্তূপের মধ্যেই ১৬ বছরের অ্যাবে বাঁচার জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্য ও পানীয় সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়। শীত নিবারণের জন্য কিছু কম্বলও জোগাড় করে সে। কম্বলের মধ্যে শীত নিবারণের জন্য দাদী ও সে জড়াজড়ি করে থেকেছে।

লিবিয়ায় পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদী শক্তির নগ্ন হামলা

অবশেষে সকল জল্পনা-কল্পনার অবসান ঘটিয়ে গত ১৯ মার্চ পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদী শক্তি অত্যাধুনিক মারণাস্ত্রে সুসজ্জিত হয়ে আফ্রিকার মুসলিম দেশ লিবিয়ার ওপর ক্ষুধার্ত নেকড়ের ন্যায় হামলে পড়েছে তেলসম্পদ লুণ্ঠন করার জিঘাংসায়। এর আগে লিবিয়াকে 'নো ফ্লাই জোন' ঘোষণা সংবলিত জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের ১৯৭৩ নম্বর প্রস্তাব গৃহীত হয় গত ১৭ মার্চ। যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থন নিয়ে বৃটেন, ফ্রান্স ও লেবানন জাতিসংঘে প্রস্তাব উত্থাপন করে। জাতিসংঘের সদর দপ্তরে অনুষ্ঠিত ভোটাভুটিতে প্রস্তাবের পক্ষে ১০ ভোট পড়ে। ১৫ সদস্যের নিরাপত্তা পরিষদের অপর পাঁচ সদস্যরাষ্ট্র ভোটাভুটিতে অংশ নেওয়া থেকে বিরত থাকে। এতে শুধু গাদ্দাফির অনুগত বাহিনীর হাত থেকে লিবিয়ার বেসামরিক নাগরিকদের রক্ষার জন্য লিবিয়ার বিরুদ্ধে যেকোন ব্যবস্থা গ্রহণের অনুমতি দেয়া হয়। কিন্তু গাদ্দাফি বাহিনী নো ফ্লাই জোন লঙ্ঘন করেছে জানিয়ে যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন ও ফ্রান্সের নেতৃত্বে পশ্চিমা জোট বাহিনী গত ১৯ মার্চ শনিবার রাতে লিবিয়ার বিভিন্ন স্থাপনায় বিমান ও ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালায়। এমনকি গত ২০ মার্চ রাতে ত্রিপোলীতে ছয় বর্গকিলোমিটির এলাকা নিয়ে অবস্থিত গাদ্দাফির প্রধান সামরিক ঘাঁটি ও বাসভবন বাব আল-আযীযিয়া চত্বরে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালানো হয়। এতে তাঁর এক সন্তান নিহত হয়েছে ও বাসভবন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তবে গাদ্দাফি তখন বাসায় ছিলেন না। উল্লেখ্য, ইতিপূর্বে ১৯৮৬ সালেও তাকে হত্যার উদ্দেশ্যে এ বাসভবনে হামলা চালানো হয়। এতে তার এক মেয়ে নিহত হলেও তিনি প্রাণে বেঁচে যান।

'ওডেসি ডন' নামের এ অভিযানে রাডার ফাঁকি দিতে সক্ষম স্টিলথ, বি-টু ও টর্নেডো বিমান, টমাহক, সাবমেরিন সহ অত্যাধুনিক যুদ্ধাস্ত্র ব্যবহার করা হচ্ছে। ২১ মার্চ রাতে তৃতীয় দফা হামলা চালানোর সময় একটি মার্কিন জঙ্গী বিমান ভূপাতিত করা হয়েছে। পরে একটি ফরাসি জঙ্গী বিমানও গুলী করে ভূপাতিত করার দাবী করেছে গাদ্দাফি বাহিনী। বৃটেন, ফ্রান্স ও ন্যাটো বাহিনীকে হামলায় সামনে ঠেলে দিয়ে পেছন থেকে কলকাঠি নাড়ছে যুক্তরাষ্ট্র। বিশ্লেষকরা বলছেন, তৃতীয়বারের মতো আরো একটি মুসলিম দেশের বিরুদ্ধে হামলা চালানোর দায় থেকে ওবামা যুক্তরাষ্ট্রকে বাঁচাতে এই কৌশল অবলম্বন করেছে। এদিকে গাদ্দাফি বাহিনীকে বিমান হামলায় পর্যুদস্ত করার পাশাপাশি ন্যাটো স্থল হামলার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। জাতিসংঘ মহাসচিব বলেছেন, গাদ্দাফি সরকার অস্ত্রবিরতি না ঘোষণা করলে নিরাপত্তা পরিষদ আরো কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। গাদ্দাফিকে দুর্বল করার জন্য লিবীয় তেল কোম্পানীগুলোর উপর যুক্তরাষ্ট্র নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে।

লিবিয়াতে হামলা শুরুর পর গত ২২ মার্চ রাতে বাব আযীযিয়া চত্বরে প্রথমবারের মতো জনসমক্ষে আসেন মুআম্মার গাদ্দাফি। সেখানে সমর্থকদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, 'আমরা যেকোন উপায়ে পশ্চিমা শক্তিকে পরাজিত করব। কখনোই তাদের কাছে আত্মসমর্পণ করব না। ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে পশ্চিমাদের স্থান হবে'। তিনি আরো বলেন, 'আমরা অবশ্যই জয়ী হব। যুদ্ধ স্বল্পমেয়াদী হোক বা দীর্ঘমেয়াদী হোক, তারা আমাদের পরাজিত করতে পারবে না'। গাদ্দাফি বলেন, 'আমি আমার বাসভবনেই আছি। এখানেই থাকব... এখানে আমার থাকার অধিকার আছে'।

পশ্চিমা জোটের এ অভিযানে বৃটেন, স্পেন, ইতালী, কানাডা, ডেনমার্ক প্রভৃতি দেশ যুদ্ধের অস্ত্রশস্ত্রের যোগান দিচ্ছে। মুসলিম দেশগুলোর মধ্যে কাতার ও আরব আমিরাত এ হামলায় যৌথ বাহিনীকে সহযোগিতা করছে। এ হামলায় এ পর্যন্ত ১০৯ জন নিহত ও ১৩০০ জন আহত হয়েছে। বিশ্বব্যাপী এ ন্যক্কারজনক হামলার বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ঝড় উড়েছে। খোদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বিক্ষোভ অনুষ্ঠিত হয়েছে। রাশিয়া, চীন, ভারত, উগান্ডা, জিম্বাবুয়ে, দক্ষিণ আফ্রিকা, নামিবিয়া, নাইজেরিয়া, ভিয়েতনাম, ভেনিজুয়েলা, বলিভিয়া, কিউবা, ইরান, আরব লীগ প্রভৃতি দেশ ও সংস্থা এ হামলার তীব্র প্রতিবাদ করেছে। রাশিয়া একে 'মধ্যযুগীয় ধর্মযুদ্ধের আহ্বান' বলে আখ্যায়িত করেছে।

অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠন : এদিকে লিবিয়ায় বিদ্রোহীরা মাহমূদ জিবরীলকে প্রধানমন্ত্রী করে একটি অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠন করেছে বলে জানা গেছে। উল্লেখ্য, রক্তপাতহীন এক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ১৯৬৯ সালে ক্ষমতায় আসেন কর্নেল গাদ্দাফি। এরপর থেকে প্রায় ৪২ বছর ধরে তিনি দোর্দণ্ডপ্রতাপে দেশ শাসন করছেন। তাঁর শাসনের অবসানের দাবীতে গত ফেব্রুয়ারীর মাঝামাঝি থেকে লিবিয়ায় সরকার বিরোধী বিক্ষোভ শুরু হয়। বিদ্রোহীরা বেনগাজি ও ত্রিপোলির পশ্চিমের শহর জাবিয়াসহ বেশ কিছু এলাকা দখল করে নেয়। গাদ্দাফির অনুগত সেনাদের সঙ্গে বিরোধীদের সংঘর্ষে এ পর্যন্ত কয়েক হাযার মানুষ নিহত হয়েছে।

আফগানিস্তানে বেসামরিক লোক হত্যা শতকরা ২৫ ভাগ বৃদ্ধি

আফগানিস্তানে গত কয়েক বছরের তুলনায় ২০১০ সালে বেসামরিক লোক হত্যার সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। গত বছর আফগানিস্তানে বেসামরিক লোক নিহত হয়েছে ২,৭৭৭ জন। বেসামরিক লোক হত্যা অন্যান্য বছরের তুলনায় শতকরা ২৫ ভাগ বেশী। এ লোক হত্যার কথা স্বীকার করেছে জাতিসংঘ মিশন।

ইসরাঈলী বোমার প্রভাব

গাযায় বেড়েছে ক্যান্সার রোগী

ইসরাঈলী বোমার প্রভাবে ফিলিস্তীনের গাযা উপত্যকায় ক্যান্সার রোগীর সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে। ২০০৮ ও ২০০৯ সালে ২২ দিনের আগ্রাসনের সময় ইহুদীবাদী ইসরাঈলী সেনারা গাযার উপর যে ইউরেনিয়াম বোমা ফেলেছিল তার কারণে ক্যান্সার ছড়িয়ে পড়েছে বলে ডাক্তাররা জানিয়েছেন। ইসরাঈলী আগ্রাসনের পর সেখানে ক্যান্সার রোগীর সংখ্যা শতকরা ৩০ ভাগ বেড়ে গেছে। ইহুদীবাদীদের ঐ আগ্রাসনে অন্তত এক হাযার ৪০০ ফিলিস্তীনী নিহত হন। এর মধ্যে বেশির ভাগই ছিল নারী ও শিশু।

ফিলিস্তীনকে স্বীকৃতি দিল উরুগুয়ে

স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে দক্ষিণ আমেরিকার আরেকটি দেশের স্বীকৃতি পেয়েছে ফিলিস্তীন। গত ১৫ মার্চ উরুগুয়ে এ স্বীকৃতি দেয়।

তবে ফিলিস্তীন রাষ্ট্রের সীমানা বিষয়ে কোন মতামত দেয়নি দেশটি। উরুগুয়ের আগে ব্রাজিল, আর্জেন্টিনা, ইকুয়েডর, বলিভিয়াসহ আরও কয়েকটি দেশ ১৯৬৭ সালে ইসরাঈল-জর্ডান যুদ্ধের আগে ফিলিস্তীনের তৎকালীন সীমানা অনুযায়ী দেশটিকে স্বীকৃতি দিয়েছে। এছাড়াও চিলি, পেরুসহ আরও কয়েকটি দেশ কোন সীমানা নির্দেশ ছাড়াই রাষ্ট্র হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছে একে।

নতুন সংবিধান অনুমোদন

মিসরে দুই মেয়াদের বেশি প্রেসিডেন্ট হওয়া যাবে না

গণভোটে মিসরের জনগণ সংশোধিত নতুন সংবিধান অনুমোদন করেছে। সংবিধান সংশোধনের ফলে মিসরে দুই মেয়াদের বেশী কেউ প্রেসিডেন্ট হ'তে পারবেন না। নির্বাচনের ৩০ দিনের মধ্যে প্রেসিডেন্টকে একজন ভাইস প্রেসিডেন্ট বেছে নিতে হবে। প্রেসিডেন্টের বয়স ৪০ বছরের বেশী হ'তে হবে এবং তাঁর স্ত্রী মিসরীয় হ'তে হবে। গত ১৯ মার্চ অনুষ্ঠিত এ গণভোটে মিসরের প্রায় সাড়ে চার কোটি ভোটারের ৪১ শতাংশ তাঁদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন। এতে ৭৭ দশমিক ২ শতাংশ ভোটার সংবিধান সংশোধনের পক্ষে এবং ২২ দশমিক ৮ শতাংশ ভোটার এর বিপক্ষে ভোট দিয়েছেন।

অ্যামনেষ্টির প্রতিবেদন

কাশ্মীরে বিনাবিচারে আটক ২০ হাযার

মানবাধিকার সংগঠন 'অ্যামনেষ্টি ইন্টারন্যাশনাল' ভারতশাসিত কাশ্মীরের জননিরাপত্তা আইনের তীব্র সমালোচনা করেছে। সংগঠনটির দাবী, এ কাল-বর্বর আইন প্রয়োগ করে ২০ হাযার ব্যক্তিকে বিনাবিচারে আটক রাখা হয়েছে। উল্লেখ্য, ভারতের গণসুরক্ষা আইন বা পিএসএ'র ক্ষমতাবলে পুলিশ রাষ্ট্রের জন্য হুমকি বলে মনে করলে যে কোন ব্যক্তিকে দুই বছর পর্যন্ত বিনা অভিযোগে আটক রাখতে পারবে।

লেখা আহ্বান

ইসলামের বিশুদ্ধ ও চিরন্তন আদর্শের প্রচার-প্রসার এবং সুস্থ সাহিত্য বিনির্মাণের অঙ্গীকার নিয়ে নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর মুখপত্র **'তাওহীদের ডাক'**। সত্যানুসন্ধিৎসু যুবক, ছাত্র ও লেখকদের নিকট থেকে বিশুদ্ধ ইসলামী আক্বীদা ও সমাজ সংস্কারমূলক প্রবন্ধ-নিবন্ধ, মুসলিম ইতিহাস-ঐতিহ্য, আহলেহাদীছ আন্দোলন, মনীষী চরিত, সাময়িক প্রসঙ্গ, কবিতা, মতামত, শিক্ষণীয় গল্প প্রভৃতি বিষয়ে লেখা আহ্বান করা হচ্ছে।

লেখা পাঠানোর ঠিকানা

নির্বাহী সম্পাদক, 'তাওহীদের ডাক'
নওদাপাড়া মাদরাসা, পোঃ সপুরা, রাজশাহী।
০১৯১৫-৩৪২৫৯৩

সংক্ষিপ্ত পোশাক ক্যান্সারের ঝুঁকি বাড়ায়

গরমে সংক্ষিপ্ত পোশাক আরামদায়ক হ'তে পারে কিন্তু অতিমাত্রায় খোলামেলা থাকার কারণে শরীরের অনাবৃত অংশে সূর্যরশ্মির প্রভাবে ত্বক ক্যান্সার হওয়ার ঝুঁকিও থাকে। ইন্ডিয়ান ক্যান্সার সোসাইটির জয়েন্ট সেক্রেটারী জ্যোৎস্না গোভিল এ ব্যাপারে সতর্ক করে বলেন, গ্রীষ্মে যারা খোলামেলা থাকে, বিশেষ করে দক্ষিণ ভারতীয়রা, তারা এ কারণে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হ'তে পারে। এটি শুধু অস্ত্রের প্রদাহই সৃষ্টি করে না, সঙ্গে ত্বক ক্যান্সারের ঝুঁকিও বাড়ায়।

হীরার তৈরী গ্রহের সন্ধান লাভ

সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের গবেষকরা এমন একটি গ্রহ আবিষ্কার করেছেন, যার পুরোটাই হীরা দিয়ে তৈরী। 'ওয়াসপ ১২ বি' নামের হীরার তৈরী এই গ্রহটি তৈরী হয়েছে কার্বনের যৌগ দিয়েই। নাসার স্পিটজার স্পেস টেলিস্কোপ ব্যবহার করে এই গ্রহটির সন্ধান পেয়েছেন গবেষকরা। গ্রহটি পৃথিবী থেকে ১ হাযার ২০০ আলোকবর্ষ দূরে অবস্থিত। উল্লেখ্য, হীরা হলো কার্বনের একটি রূপ।

গাড়ির গতি ঘণ্টায় হাযার মাইল

গাড়ি ছুটবে ঘণ্টায় হাযার মাইল গতিতে। তার শরীরে থাকবে রকেটের প্রযুক্তি। তবেই সেটা সম্ভব। যে ব্রিটিশ গবেষকদল বিশ্বের দ্রুততম গাড়ির প্রজেক্টের দায়িত্ব নিয়েছেন তাদের শীর্ষে থাকা রিচার্ড নোবল জানিয়েছেন, সম্পূর্ণ পরিকল্পনার বিষয়টি খোলাসা করে। পরিকল্পনায় ফর্মুলা ওয়ানের একটি রেসিং গাড়ির শরীরে জুড়ে দেয়া হবে রকেট প্রযুক্তি এবং এটি ফাইটার জেট বা জঙ্গী বিমানের ইঞ্জিন। তারপর সেই গাড়ি ছুটতে পারবে ঘণ্টায় হাযার মাইল বা ১৬০০ কিলোমিটার গতিতে। যা গাড়ির গতির ইতিহাসে তৈরী করবে এক নতুন মাইলস্টোন।

আগাম সংকেত ডায়াবেটিসের

চিকিৎসাবিজ্ঞানীরা বলছেন, কারো ডায়াবেটিস হবে কিনা তা একটি সাধারণ রক্ত পরীক্ষার মাধ্যমে ১০ বছর আগেই বলা সম্ভব। অর্থাৎ ডায়াবেটিস হওয়ার প্রথম লক্ষণ দেখা দেয়ার ১০ বছর আগেই বলে দেয়া যাবে এ রোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা আছে কি-না। মার্কিন বিজ্ঞানীরা রক্তে পাঁচটি অ্যামাইনো এসিডের মাত্রা নির্ণয় করে সঠিকভাবে চিহ্নিত করতে পেরেছেন যে, কাদের টাইপ ২ ডায়াবেটিস হ'তে চলেছে। তাই হার্ভার্ডের বিজ্ঞানীরা এই একই ধরনের পরীক্ষার মাধ্যমে টাইপ ২ ডায়াবেটিস সম্পর্কে আগে থেকেই সতর্কতা ঘোষণা করতে পারবেন বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন। চিকিৎসাবিজ্ঞানীরা বলছেন, ডায়াবেটিসের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অন্ধত্বসহ অন্যান্য রোগের বিরুদ্ধেও এর ফলে ব্যবস্থা নেয়া সহজ হবে।

বিজ্ঞান ও বিস্ময়

সংগঠন সংবাদ

আন্দোলন

যেলা সম্মেলন

আহলেহাদীছ কোন মতবাদের নাম নয়; এটি একটি পথের নাম

- মুহতারাম আমীরে জামা'আত

কুষ্টিয়া-পশ্চিম ১ মার্চ মঙ্গলবার : অদ্য বাদ আছর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' কুষ্টিয়া-পশ্চিম সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে দৌলতপুর উপযেলা আহলেহাদীছ জামে মসজিদ প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত কুষ্টিয়া-পশ্চিম যেলা সম্মেলনে প্রধান অতিথির ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** উপরোক্ত কথা বলেন। তিনি বলেন, আমাদের প্রথম পরিচয় হ'ল- আমরা মানুষ। অতঃপর আমরা মুসলমান। অতঃপর আমাদের বৈশিষ্ট্যগত পরিচয় আমরা 'আহলেহাদীছ'। অর্থাৎ পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের নিঃশর্ত অনুসারী। আর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' হ'ল ছাহাবায়ে কেরামের যুগ থেকে চলে আসা নির্ভেজাল ইসলামী আন্দোলনের নাম। সৃষ্টিকে স্রষ্টার বিধান অনুযায়ী পরিচালনা করাই হ'ল এই আন্দোলনের মূল লক্ষ্য। জীবনের সকল ক্ষেত্রে মুসলিম হিসাবে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের বিধান অনুযায়ী নিজেকে পরিচালনা করার মাধ্যমে ইহকালীন শান্তি ও পরকালীন মুক্তি হাছিল করাই আমাদের ব্রত। তিনি সকলকে আহলেহাদীছ আন্দোলনের পতাকা তলে সমবেত হয়ে বাংলার ঘরে ঘরে হকের দাওয়াত পৌঁছে দেওয়ার আহ্বান জানান।

দৌলতপুর বালিকা উচ্চবিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক আলহাজ্জ এহসানুল হক-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম, 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি ডঃ এ.এস.এম. আযীযুল্লাহ ও বর্তমান কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুর রশীদ আখতার। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি জনাব গোলাম যিল কিবরিয়া, খুলনা যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম, মেহেরপুর যেলা 'আন্দোলন'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক মাওলানা মানছূরুর রহমান প্রমুখ।

জীবনের সর্বক্ষেত্রে অহি-র বিধান মেনে চলুন!

- মুহতারাম আমীরে জামা'আত

গাযীপুর ৮ মার্চ মঙ্গলবার : অদ্য বাদ আছর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' গাযীপুর সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে মণিপুর বাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদ প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত গাযীপুর যেলা সম্মেলনে প্রধান অতিথির ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** উপরোক্ত আহ্বান জানান। তিনি বলেন, আল্লাহ প্রেরিত বিধানই চিরন্তন সত্য। এ বিধানের নিরপেক্ষ অনুসরণই মানুষের ইহকালীন কল্যাণ ও পরকালীন মুক্তি নিশ্চিত করতে পারে। অপরদিকে এই বিধানের বিরুদ্ধাচরণের ফলে বিগত বহু সভ্যতা ধ্বংস হয়েছে। আমরাও যদি তা করি, তাহ'লে আমাদেরকেও ধ্বংস হ'তে হবে। অতএব কেবল নারী নীতি নয়, বরং কোন বিষয়েই পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ বিরোধী কোন আইন করা সরকারের জন্য আদৌ কল্যাণকর হবে না।

যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি জনাব হাবীবুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার ও প্রশিক্ষণ সম্পাদক ডঃ মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন 'যুবসংঘ'-এর সাবেক কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মুহাম্মাদ জালালুদ্দীন, ঢাকা যেলা 'যুবসংঘ'-এর সাবেক সহ-সভাপতি বর্তমানে কুয়েতে কর্মরত মিয়াঁ মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান, ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর দাঈ মুহাম্মাদ শফীকুল ইসলাম প্রমুখ।

ইসলামই নারীকে সুষম অধিকার ও যথাযথ মর্যাদা প্রদান করেছে

- মুহতারাম আমীরে জামা'আত

গাইবান্ধা-পশ্চিম ১৫ মার্চ মঙ্গলবার : অদ্য বাদ আছর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' গাইবান্ধা-পশ্চিম সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে গোবিন্দগঞ্জ থানাধীন ছয়ঘরিয়া হাইস্কুল ময়দানে অনুষ্ঠিত গাইবান্ধা-পশ্চিম যেলা সম্মেলনে প্রধান অতিথির ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** উপরোক্ত কথা বলেন। তিনি বলেন, ইসলাম পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থার নাম। ইসলাম পুরুষ ও নারীর সমঅধিকারের ক্ষেত্রে এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে, যা বিশ্ব ইতিহাসে নারীর মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় বিরল ও অতুলনীয়। তিনি সরকারকে ইসলামের দেওয়া উত্তরাধিকার নীতিমালা উপলব্ধি করে তা বাস্তবায়নের উদাত্ত আহ্বান জানান।

যেলা 'আন্দোলন'-এর প্রধান উপদেষ্টা আলহাজ্জ নূরুল ইসলাম প্রধানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার ও প্রশিক্ষণ সম্পাদক ডঃ মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক মুহাম্মাদ সাইফুল ইসলাম বিন হাবীব ও যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ আবু হানীফ।

উল্লেখ্য যে, মুহতারাম আমীরে জামা'আত তাঁর সফরসঙ্গীদের নিয়ে তাঁর উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত গোবিন্দগঞ্জ টিএণ্ডটি আহলেহাদীছ জামে মসজিদ সংলগ্ন জনাব আলহাজ্জ নূরুল ইসলাম প্রধানের বাসায় দুপুরে আতিথেয়তা গ্রহণ করেন। অতঃপর বাদ আছর তিনি টিএণ্ডটি মসজিদে সমবেত মুছল্লীদের উদ্দেশ্যে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য পেশ করেন।

ইসলাম মানবতার একমাত্র মুক্তি সনদ

-মুহতারাম আমীরে জামা'আত

কুষ্টিয়া-পূর্ব ১৯ মার্চ শনিবার : অদ্য বাদ আছর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'

কুষ্টিয়া-পূর্ব সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে শহরের পাবলিক লাইব্রেরী ময়দানে অনুষ্ঠিত কুষ্টিয়া-পূর্ব যেলা সম্মেলনে প্রধান অতিথির ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** উপরোক্ত কথা বলেন। তিনি বলেন, ইসলাম স্বভাবধর্ম এবং শাশ্বত ও অপরিবর্তনীয় জীবনবিধান। যদি এর চিরন্তন বিধানকে আঁকড়ে ধরে চলা যায়, তাহ'লে তা মানবতার স্থায়ী মুক্তির সোপান রচনা করবে, যা কখনো বিনষ্ট হবার নয়। তিনি সকলকে ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক জীবন গঠনের মাধ্যমে ইহকালীন শান্তি ও পরকালীন মুক্তি হাছিলের আহ্বান জানান। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি কাযী মাওলানা আব্দুল ওয়াহ্হাবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম, অর্থ-সম্পাদক জনাব বাহারুল ইসলাম, 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি ডঃ এ.এস.এম. আযীযুল্লাহ, ডঃ মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম ও 'যুবসংঘ'-এর বর্তমান কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুর রশীদ আখতার। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন কুষ্টিয়া-পশ্চিম যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ গোলাম যিল কিবরিয়া।

অভ্রান্ত সত্যের চূড়ান্ত উৎস আল্লাহ্র অহি

- মুহতারাম আমীরে জামা'আত

দিনাজপুর-পূর্ব ২১ মার্চ সোমবার : অদ্য বাদ আছর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' দিনাজপুর-পূর্ব সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে বিরামপুর থানাধীন শিবপুর উচ্চবিদ্যালয় ময়দানে অনুষ্ঠিত দিনাজপুর-পূর্ব যেলা সম্মেলনে প্রধান অতিথির ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** উপরোক্ত কথা বলেন। তিনি বলেন, ইসলাম ও জাহেলিয়াতের দ্বন্দ্ব চিরন্তন। ইসলামের মূল ভিত্তি হ'ল আল্লাহ্র 'অহি' তথা পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ। আর জাহেলিয়াতের দাবী হ'ল Man-made theory যা এক কথায় মূর্খতা। বিশ্ব শান্তির সবচেয়ে বড় হুমকি হ'ল জাহেলিয়াত, যাকে দূর করার জন্য বিশ্ব শান্তির মহানায়ক মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে অহি-র বার্তাবাহক ও রহমাতুল লিল আলামীন হিসাবে আল্লাহ তা'আলা দুনিয়ায় পাঠিয়েছিলেন। তিনি কোন একক গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের নবী নন; বরং তিনি বিশ্ব মানবতার জন্য জাহান্নামের ভয় প্রদর্শক, জান্নাতের সুসংবাদদাতা ও মহান শিক্ষক হিসাবে প্রেরিত হয়েছিলেন। এই মতবাদবিক্ষুব্ধ ও অশান্ত পৃথিবীতে শান্তি আনতে চাইলে আমাদেরকে মূল ইসলামের দিকেই ফিরে যেতে হবে। তিনি সকলকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ্র প্রকৃত অনুসারী হওয়ার উদাত্ত আহ্বান জানান।

যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুল হক-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপড়া, রাজশাহীর ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ মাওলানা আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ ও ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক মুহাম্মাদ সাইফুল ইসলাম বিন হাবীব প্রমুখ।

আহলেহাদীছের মাদরাসাগুলিকে শিরক ও বিদ'আত মুক্ত রাখুন

-শিক্ষক-ছাত্র-অভিভাবকদের উদ্দেশ্যে আমীরে জামা'আত

মুকুন্দপুর ফাযিল মাদরাসা, বিরামপুর, দিনাজপুর : অদ্য ২২ মার্চ মঙ্গলবার সকাল ১০ ঘটিকায় মাদরাসা কক্ষে আয়োজিত এক সংবর্ধনা সভায় মুহতারাম আমীরে জামা'আত উপরোক্ত আহ্বান জানান। তিনি বলেন, ১৯৫১ সালে এই মাদরাসা যারা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, তাদের উদ্দেশ্য ছিল 'কুরআন ও হাদীছের প্রকৃত ইলমের প্রচার ও প্রসার ঘটানো এবং এ অঞ্চলকে শিরক ও বিদ'আত হ'তে মুক্ত করা'। কিন্তু আজ সরকারী হস্তক্ষেপ ও রাজনৈতিক দলাদলিতে আমাদের মাদরাসাগুলি অনেকাংশে তার স্বকীয়তা হারিয়ে ফেলেছে। যদিও বাহ্যিক জৌলুস বেড়েছে। তিনি মাদরাসার প্রতিষ্ঠাতাদের মহান স্বপ্ন বাস্তবায়নের প্রতি যত্নশীল থাকার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আহ্বান জানান।

এর পূর্বে তিনি মাদরাসা কম্পাউণ্ডে পৌঁছার সাথে সাথে মাঠে কর্মরত শতাধিক কর্মজীবী মানুষ এসে তাঁকে এক নযর দেখার জন্য ঘিরে ধরে। তখন তিনি বারান্দায় দাঁড়িয়ে তাদের উদ্দেশ্যে নাতিদীর্ঘ ভাষণ দেন। সেখানে তিনি বলেন, আপনারাই দেশের মূল সম্পদ। আপনাদের ঘাম ঝরনো শ্রমে মাঠে ফসল ফলে। দেশের উন্নয়ন হয়। আপনারা কেবল পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত আদায় করুন, হালাল-হারাম বেছে চলুন, সকল কাজে আল্লাহকে ভয় করুন, রাসূলের ওয়াদা মতে ধনীদের পাঁচশ' বছর পূর্বে আপনারা গরীবেরা জান্নাতে চলে যাবেন। তিনি তাদের সকলের সাথে মুছাফাহা করেন ও কুশল বিনিময় করেন।

অতঃপর তিনি দূরে অপেক্ষমান ছাত্রীদের নিকট গমন করেন ও তাদের উদ্দেশ্যে সংক্ষিপ্ত ভাষণে বলেন, তোমরাই জাতির মা। তোমাদের হাতে গড়া পরিবারগুলি যেন পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের দুর্গ হয়ে গড়ে ওঠে, সে দায়িত্ব তোমাদের পালন করতে হবে এবং সেজন্য যথাযথ শিক্ষা লাভ অতীব যরূরী। তোমরা দ্বীনী ইলমে পারদর্শী হও, আমরা সেই দো'আ করি।

সকল ভ্রান্ত আক্বীদা পরিহার করে ছহীহ আক্বীদায় ফিরে আসুন

- মুহতারাম আমীরে জামা'আত

দিনাজপুর-পশ্চিম ২২ মার্চ মঙ্গলবার : অদ্য বাদ আছর দিনাজপুর সদর থানাধীন তেঘরা দারুল হাদীছ সালাফিইয়াহ মাদরাসা প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত দিনাজপুর-পশ্চিম যেলা সম্মেলনে প্রধান অতিথির ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** উপরোক্ত কথা বলেন। তিনি বলেন, মুমিন জীবনের মূল বিষয় হচ্ছে আক্বীদা। আক্বীদা ছহীহ না হ'লে আমল কোন কাজে আসবে না। আল্লাহ্র পরিচয় সম্পর্কে তিনি বলেন, আল্লাহ নিরাকার নন বরং তাঁর আকার আছে। তবে তা কোন কিছুর সাথে তুলনীয় নয়। অনুরূপভাবে তাঁর সত্তা সর্বত্র বিরাজমান নয় বরং তিনি সাত আসমানের উপরে আরশে সমাসীন। তবে তাঁর জ্ঞান ও শক্তি সর্বত্র বিরাজমান। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নূরের তৈরী নন বরং তিনি মাটির তৈরী। তিনি আমাদের মতই একজন মানুষ। তবে পার্থক্য হ'ল তাঁর নিকটে 'অহি' অবতীর্ণ হ'ত *(কাহফ ১১০)*। তিনি বলেন, আল্লাহ মুখাপেক্ষীহীন। সৃষ্টিকে পরিচালনার জন্য মা'রেফতীদের আবিষ্কৃত নাজীব, নাক্বীব, আবদাল, কুতুব, আওতাদ ও গাওছুল আযম সহ ৪৪১ জনের বিশাল পার্লামেন্টের সহযোগিতার কোন

প্রয়োজন তাঁর নেই। তিনি পরকালে আল্লাহ্র দীদার লাভের জন্য শিরকবিমুক্ত নির্ভেজাল তাওহীদ বিশ্বাস এবং বিদ'আত মুক্ত আমলে ছালেহ সম্পাদনের জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানান।

মাদরাসার সভাপতি আলহাজ্জ আব্দুল্লাহিল কাফী-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহীর ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ মাওলানা আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি মুযাফ্ফর বিন মুহসিন।

উল্লেখ্য যে, সম্মেলনে যোগদানের পূর্বে মুহতারাম আমীরে জামা'আত যেলা সভাপতি ইদ্রীস আলী ও অন্যান্য সফরসঙ্গীদের নিয়ে পার্শ্ববর্তী সাতভায়া পাড়া গ্রামে যান ও তাঁর বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের অতীব হিতাকাংখী মুরব্বী ও সহকর্মী প্রফেসর ডঃ আফতাব আহমাদ রহমানীর কবর যেয়ারত করেন। অতঃপর তিনি তাঁর উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত সাতভায়া পাড়া জামে মসজিদে গমন করেন ও সেখানে মাগরিব ও এশার ছালাত আদায় করেন। স্মর্তব্য যে, ১৯৮৪ সালের ১৯শে এপ্রিল ডঃ রহমানীর মৃত্যুর পর মুহতারাম আমীরে জামা'আত রাজশাহী থেকে তাঁর লাশ নিয়ে এসেছিলেন এবং এখানে তাঁর দাফন ও জানাযায় শরীক হয়েছিলেন। উক্ত জানাযায় ডঃ আব্দুল বারী, আব্দুল মতীন সালাফী, আতীকুর রহমান (বাজেট অফিসার, রাবি) যোগদান করেছিলেন। কিন্তু আজ তাঁরা সবাই মৃত। মুহতারাম আমীরে জামা'আত সকলের রূহের মাগফিরাত কামনা করে দো'আ করেন।

লিবিয়ায় বিমান হামলা বর্বরোচিত ও মানবতাবিরোধী

-আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম ও সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম এক বিবৃতিতে জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে লিবিয়ায় 'অপারেশন ওডেসি ডন' নামে পরিচালিত ইঙ্গ-মার্কিন বিমান হামলার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছেন। তারা বলেন, গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার নামে এ হামলা বর্বরোচিত ও চরম মানবতাবিরোধী। এ হামলার মাধ্যমে পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদী অপশক্তি তাদের পূর্বের মুখোশ পুনরায় উন্মোচন করল। ইরাক ও আফগানিস্তানের মত তারা লিবিয়াকেও ধ্বংস করতে চায়। নেতৃবৃন্দ বলেন, মূলতঃ লিবিয়ার তেল সম্পদ লুণ্ঠন করাই এদের মূল টার্গেট। তারা বলেন, এ হামলা শুধু লিবিয়ার বিরুদ্ধে নয়, বরং এ হামলা মুসলিম বিশ্বের বিরুদ্ধে ও গোটা মানব সভ্যতার বিরুদ্ধে। তারা অবিলম্বে এই অন্যায় হামলা বন্ধ করার জন্য বিশ্ব নেতৃবৃন্দের প্রতি আহ্বান জানান।

কুরআন বিরোধী আইন প্রণয়নের পরিণতি হবে আল্লাহ্র গযব ডেকে আনা

-আহলেহাদীছ আন্দোলন ও যুবসংঘ

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর সাধারণ সম্পাদক আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব এক যুক্ত বিবৃতিতে বলেন, ইসলামই একমাত্র ধর্ম যা নারীর ন্যায্য অধিকার ও যথাযথ মর্যাদা নিশ্চিত করেছে। যা সমাজে যথাযথ ভাবে বাস্তবায়ন করার কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করাই সরকারের প্রধান দায়িত্ব। তাঁরা বলেন, দেশের শতকরা ৯০ ভাগ নাগরিক মুসলমান। কুরআনের প্রতিটি বিধান তাদের কাছে শিরোধার্য। অথচ জনগণের রায় নিয়ে ক্ষমতায় গিয়ে সরকার একের পর এক গণবিরোধী কাজ করে যাচ্ছে। মুসলিম উত্তরাধিকারী আইন পরিপন্থী 'সিডো' বাস্তবায়ন, ফৎওয়া নিষিদ্ধকরণ, ধর্মহীন শিক্ষানীতি বাস্তবায়ন ও কুরআন বিরোধী নারীনীতি প্রণয়ন করে সরকার জনগণের আক্বীদা-বিশ্বাসের উপর চরমভাবে আঘাত হেনেছে। এটা এদেশের ইসলামপ্রিয় জনগণ মেনে নিতে পারে না। কুরআন বিরোধী আইন প্রণয়নের মাধ্যমে দেশ ও জাতির উপরে আল্লাহ্র গযব ডেকে আনা ছাড়া কিছুই নয় বলে তারা উল্লেখ করেন। তারা এসব কাজ থেকে ফিরে এসে জনস্বার্থে কাজ করার জন্য সরকার ও সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানান।

মৃত্যু সংবাদ

(১) 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' জয়পুরহাট যেলার অন্যতম উপদেষ্টা, ক্ষেতলাল থানাধীন তালশন গ্রামের জনাব আব্দুল মাজেদ (৮১) বার্ধক্যজনিত কারণে গত ৩রা মার্চ রবিবার দিবাগত রাত ১০-টায় নিজ বাসভবনে ইন্তেকাল করেন। *ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজে'উন*। তিনি স্ত্রী, ৪ ছেলে ও ৪ মেয়ে সহ বহু আত্মীয়-স্বজন রেখে গেছেন। দুপুর ২-টায় নিজ গ্রাম তালশনে মাওলানা আবুল হোসাইনের ইমামতিতে তার জানাযার ছালাত অনুষ্ঠিত হয়। জানাযায় যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাহফূযুর রহমান সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ ও স্থানীয় ওলামায়ে কেরাম উপস্থিত ছিলেন। ঐ দিন সন্ধ্যা ৭-টায় পারিবারিক গোরস্থানে তাকে দাফন করা হয়।

(২) 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর 'কেন্দ্রীয় পরিষদ সদস্য' ও রাজবাড়ী সাংগঠনিক যেলার সভাপতি জনাব মুহাম্মাদ আবুল কালাম আযাদ গত ৫ই মার্চ সকাল সোয়া ৮-টায় নিজ বাড়ীতে ইন্তেকাল করেন। *ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজে'উন*। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৫ বছর। তিনি স্ত্রী, ৩ ছেলে ও ২ মেয়ে সহ বহু আত্মীয়-স্বজন ও গুণগ্রাহী রেখে গেছেন। ঐদিন বিকাল সাড়ে ৪-টায় সত্যজিৎপুর মধ্যপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদ প্রাঙ্গণে তাঁর বড় ছেলে আব্দুল্লাহ্র ইমামতিতে প্রথম জানাযার ছালাত অনুষ্ঠিত হয়। অতঃপর বিকাল সাড়ে ৫-টায় মৈশালা দারুল উলূম দাখিল মাদরাসা ময়দানে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীর **প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**-এর ইমামতিতে তার দ্বিতীয় জানাযা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত জানাযায় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম, অর্থ সম্পাদক বাহারুল ইসলাম, প্রচার ও প্রশিক্ষণ সম্পাদক ডঃ মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, কুষ্টিয়া-পূর্ব যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ হাশিমুদ্দীন ও যেলা যুবসংঘের সভাপতি আমীনুর রহমান ও অন্যান্যগণ, পাবনা যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা বেলালুদ্দীন, মেহেরপুর যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক তরীকুয্যামান, ঝিনাইদহ যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাষ্টার ইয়াকূব হোসাইন ও দফতর সম্পাদক বরীউল ইসলাম, গাযীপুর যেলা 'আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র সভাপতি হাতেম বিন খসরু পারভেয প্রমুখ। তাঁকে মৈশালা গোরস্থানে দাফন করা হয়।

উল্লেখ্য যে, দাফন শেষে মুহতারাম আমীরে জামা'আত মৈশালা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে মাগরিবের ছালাত আদায় করেন এবং সমবেত মুছল্লীদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য পেশ করেন। এ সময় তিনি মসজিদ সুন্দর করার চেয়ে বরং মসজিদ আবাদ করার প্রতি গুরুত্বারোপ করেন। একই সময়ে রাজবাড়ী যেলা 'আন্দোলন'-এর দায়িত্বশীলদের সাথে পৃথকভাবে বৈঠকে বসেন কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক নূরুল ইসলাম। তিনি তাদের সাথে পরামর্শের ভিত্তিতে জনাব মকবূল হোসাইনকে রাজবাড়ী যেলা 'আন্দোলন'-এর ভারপ্রাপ্ত সভাপতি করে যেলা কমিটি পুনর্গঠন করেন। অতঃপর মুহতারাম আমীরে জামা'আত উপস্থিত সকলের নিকট থেকে শারঈ আনুগত্যের বায়'আত গ্রহণ করেন।

প্রশ্নোত্তর

দারুল ইফতা
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

প্রশ্ন (১/২৪১): কোন ব্যক্তির দীর্ঘ রোগভোগের কারণ কি? কেউ বলে এটা তার কৃতকর্মের ফল। আবার কেউ বলে এর মাধ্যমে আল্লাহ তার পাপ মাফ করেন।

-সুরাইয়া
পাঁচদোনা, নরসিংদী।

উত্তর : পৃথিবীতে আল্লাহ মানুষের পরীক্ষা নিতে চান যে কে তাদের মাঝে সর্বোত্তম আমল করে *(সূরা মুলক ২)*। তাই প্রতিটি মানুষই প্রতিনিয়ত পরীক্ষার সম্মুখীন। এ পরীক্ষার ধরন বিভিন্ন হ'তে পারে *(বাক্বারাহ ১৫৫)*। যেমন কাউকে মন্দ ও কাউকে ভাল দ্বারা *(আম্বিয়া ৩৫)*। আল্লাহ এই বিপদ দিতে পারেন তার কৃতকর্মের শাস্তি হিসাবে *(শূরা ৩০, সাজদাহ ২১)*, আবার কখনো তাকে নিষ্পাপ করে জান্নাতে প্রবেশের সুযোগ দানের উদ্দেশ্যে *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৫৩৭)*। সুতরাং এ সকল বিষয় ব্যক্তি ভেদে বিভিন্ন কারণে হ'তে পারে, যা আল্লাহই সর্বাধিক অবগত।

প্রশ্ন (২/২৪২) : স্বামী জীবিত অবস্থায় তার স্ত্রীকে ছালাত সহ অন্যান্য সৎ কাজের তাকীদ দেন। কিন্তু স্ত্রী তা অবহেলা করে। এজন্য স্বামী তার উপর অসন্তুষ্ট ছিলেন। এমতাবস্থায় স্বামী মারা যান। বর্তমানে স্ত্রী ছালাত ও সৎ কাজের প্রতি খুবই ঝুঁকে পড়েছে। জনৈক আলেম বলেন, আল্লাহ্‌র কসম! যার উপর স্বামী অসন্তুষ্ট, ঐ মহিলা জাহান্নামী। উক্ত বক্তব্য কি সঠিক?

-এস.পি. ছাকিব
হোসেনপুর, গাবতলী, বগুড়া।

উত্তর : স্বামীর আনুগত্য না করা একটি কঠিন অপরাধ। রাসূল (ছাঃ) জনৈকা মহিলাকে বলেন, স্বামী তোমার জান্নাত ও জাহান্নাম *(নাসাঈ কুবরা, আহমাদ, সিলসিলা ছহীহাহ হা/২৬১২, সনদ ছহীহ)*। অন্য হাদীছে বলা হয়েছে, স্বামীর অবাধ্যতার কারণে মহিলারা বেশী বেশী জাহান্নামে যাবে *(বুখারী হা/১০৫২; মিশকাত হা/১৪৮২)*।

তবে কোন মহিলা যদি অনুতপ্ত হয়ে তওবা করে তাহ'লে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করতে পারেন। কারণ শিরক ব্যতীত যাবতীয় পাপ আল্লাহ তা'আলা ইচ্ছা করলে ক্ষমা করে দিতে পারেন *(নিসা ৪৮ ও ১১৬)*। সুতরাং উক্ত বক্তব্য সঠিক নয়।

প্রশ্ন (৩/২৪৩) : ওযূ করার সময় মেয়েরা কি মাথার কাপড় ফেলে মাথা মাসাহ করবে? মেয়েদের মাথার কাপড় পড়ে গেলে এবং বেগানা পুরুষ দেখলে ওযূ নষ্ট হয় কি?

-সাজেদা
সাহারবাটি, মেহেরপুর।

উত্তর : মাথার কাপড় সরিয়ে বা যেভাবে সুবিধা হবে সেভাবে মাথা মাসাহ করবে। তবে পুরুষ ও মহিলার ওযূর পদ্ধতির মধ্যে কোন পার্থক্য নেই *(নাসাঈ হা/১০০, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৪২)*। মেয়েদের মাথার কাপড় পড়ে গেলে বা বেগানা পুরুষ দেখলে ওযূ নষ্ট হয় না। কারণ এগুলো ওযূ ভঙ্গের কারণ সমূহের অন্তর্গত নয়।

প্রশ্ন (৪/২৪৪) : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, কালো কুকুর, গাধা ও নারী মুছল্লীর সামনে দিয়ে গেলে তার ছালাত নষ্ট হয়ে যায় (ইবনে মাজাহ, আবুদাউদ)। হাদীছটির ব্যাখ্যা জানিয়ে বাধিত করবেন।

-রাবেয়া বেগম
অপরূপা, দিনাজপুর।

উত্তর : উক্ত হাদীছের অর্থ হ'ল, ছালাতের নেকী কম হয়, সম্পূর্ণ ছালাত বাতিল হয় না। কারণ এতে ছালাতের একাগ্রতা বিনষ্ট হয় *(তুহফাতুল আহওয়াযী ২/২৫৯; বলূগুল মারাম হা/২২৮-এর ব্যাখ্যা দ্রঃ)*।

প্রশ্ন (৫/২৪৫) : সূরা বাক্বারাহ ২৩৮ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, 'তোমরা সকল ছালাতের প্রতি যত্নবান হও, বিশেষ করে মধ্যবর্তী ছালাতের প্রতি'। এখানে মধ্যবর্তী ছালাত কি এবং এ ছালাতের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করার কারণ কি?

-মুহাম্মাদ শহীদুল ইসলাম
ধাক্কামারা, পঞ্চগড়।

উত্তর : মধ্যবর্তী ছালাত বলতে এখানে আছর ছালাতকে বুঝানো হয়েছে। অন্যান্য ফরয ছালাত অপেক্ষা এ ছালাতের গুরুত্ব অনেক বেশী। কারণ নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তির আছর ছালাত ছুটে গেল তার এমন ক্ষতি হ'ল যেমন ক্ষতি হয় তার ধন-সম্পদ ও পরিবারবর্গ সবকিছু ধ্বংসপ্রাপ্ত হ'লে *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫৯৪)*। অন্য হাদীছে এসেছে, তার আমল বরবাদ হয়ে গেল *(বুখারী, মিশকাত হা/৫৯৫)*।

প্রশ্ন (৬/২৪৬) : ক্বিয়ামতের দিন সূর্য ও চন্দ্র কি অবস্থায় থাকবে? তারা কি জাহান্নামে থাকবে?

-রুমানা আখতার

কাঞ্চন, দিনাজপুর।

উত্তর : সূর্য ও চন্দ্র উভয়কে ক্বিয়ামতের দিন আলোহীন করা হবে *(বুখারী, মিশকাত হা/৫৫২৬)*। সূর্য মাত্র এক মাইল দূরে থাকবে *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫৫৪০)*। তারপর জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে *(সিলসিলা ছাহীহাহ হা/১২৪, ১/১২৩ পৃঃ)*।

উল্লেখ্য, সূর্য ও চন্দ্রকে শাস্তি দেওয়ার জন্য জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে না; বরং এগুলিকে যারা পূজা করেছে তাদেরকে অপদস্থ করার জন্য এটা করা হবে। মা'বূদের অবস্থা যদি এরূপ হয় তাহ'লে তাদের যারা পূজা করেছে তাদের অবস্থা কেমন হ'তে পারে?

প্রশ্ন (৭/২৪৭) : আমাদের মসজিদের খত্বীব বলেছেন, ফজরের আযানের পর ২ রাক'আত দুখূলুল মসজিদ ও ২ রাক'আত সুন্নাত ছালাত ছাড়া অন্য কোন ছালাত পড়া যাবে না। এ বক্তব্য কি সঠিক?

-মুহাম্মাদ ছফিউল্লাহ
খান এ সবুর রোড, খুলনা।

উত্তর : যারা রাত্রির ছালাতে অভ্যস্ত তারা ফজর উদিত হওয়ার পূর্বে তাহাজ্জুদ ও বিতর ছালাত আদায় করবেন। *(তিরমিযী হা/৪৬৬)*। তবে ভুলক্রমে বা ঘুমের কারণে উক্ত সময়ে উঠতে না পারলে যখন মনে হবে বা ঘুম থেকে জেগে উঠবেন তখন পড়ে নিবেন। যদিও তা আযানের পর জামা'আত শুরু হওয়ার আগে হয় *(তিরমিযী হা/৪৬৪; তুহফাতুল আহওয়াযী ২/৪৬৬ পৃঃ; মিশকাত হা/১২৭৯)*। সুতরাং উক্ত বক্তব্য সঠিক নয়।

প্রশ্ন (৮/২৪৮) : কোন হিন্দু লোক ঘরে এলে সেই জায়গায় ছালাত আদায় করা যাবে কি?

-অধ্যাপক জালালুদ্দীন
রসূলপুর, নারায়ণগঞ্জ।

উত্তর : বিধর্মীরা আল্লাহ্র সাথে শিরক করার কারণে সত্তাগতভাবে অপবিত্র *(তওবা ২৮)*। তাই বলে তারা শারীরিকভাবে অপবিত্র- এমনটা নয়। তাদের সাথে উঠা-বসা, লেন-দেন সবই জায়েয। তাই তারা ঘরে প্রবেশ করলে সেখানে ছালাত আদায় নাজায়েয হওয়ার কোন কারণ নেই। এমনকি তারা যদি অনুমতি নিয়ে মসজিদেও প্রবেশ করে তাতেও কোন বাধা নেই। কেননা রাসূল (ছাঃ) মসজিদে অবস্থানকালীন তাঁর নিকট ওয়াফদে নাজরান, ওয়াফদে ছাক্বীফ ইত্যাদি বিধর্মী প্রতিনিধি দল ও ব্যক্তিরা উপস্থিত হয়েছে, এমন অনেক দৃষ্টান্ত রয়েছে। তেমনিভাবে বিধর্মীদের গৃহে বা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানেও ইবাদত করা যাবে যদি সেখানে আপত্তিকর কিছু না থাকে ।

প্রশ্নঃ (৯/২৪৯): পরকালে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর পিতা-মাতার অবস্থান কি হবে?

-মুহাম্মাদ যাকির মজুমদার
কচুয়া, চাঁদপুর।

উত্তর : মুশরিক অবস্থায় মারা যাওয়ার কারণে তারা জাহান্নামী হবে। রাসূল (ছাঃ)-কে তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করার অনুমতি দেওয়া হয়নি *(তওবাহ ১১৩; মুসলিম, মিশকাত হা/১৭৬৩)*। রাসূল (ছাঃ) তাঁর পিতার ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হ'লে উত্তরে বলেন, আমার পিতা জাহান্নামী *(মুসলিম হা/৫২১; ইবনু মাজাহ হা/১৫৭৩; সিলসিলা ছাহীহাহ হা/১৮)*।

প্রশ্নঃ (১০/২৫০) : একটি মাসিক ইসলামী পত্রিকায় বলা হয়েছে আলী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, 'পাপ কাজ করে লজ্জিত হ'লে পাপ কমে যায়। আর নেক কাজ করে গর্ববোধ করলে নেকী বরবাদ হয়ে যায়'। কথাটি কতটুকু সত্য?

-সোহেল হাজারী
পূর্বডগরী, মণিপুর, গাযীপুর।

উত্তর : উক্ত মর্মে কোন ছহীহ দলীল পাওয়া যায় না।

প্রশ্ন (১১/২৫১) : কবরের আযাব কবরে হয় না আসমানে হয়? একজন খত্বীবের বক্তব্যে জানতে পারি যে, কবরের আযাব আসমানে হয়। তিনি সূরা বাক্বারাহ্র ২৮ আয়াত দ্বারা দলীল দিয়েছেন।

-মুহাম্মাদ মশিউর রহমান
ইতিহাস বিভাগ
রাজশাহী কলেজ, রাজশাহী।

উত্তর : কবরের আযাব সত্য *(আন'আম ৯৩, মুমিন ৪৬)*। যা অসংখ্য ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত *(বুখারী, মিশকাত হা/১২৬, আহমাদ, মিশকাত হা/১৬৩০, সনদ ছহীহ)*। রাসূল (ছাঃ) সবসময় কবরের আযাব থেকে পানাহ চাইতে বলেছেন *(মুসলিম, মিশকাত হা/৯৪০)*। এক্ষণে কবরের আযাব শারীরিকভাবে কিংবা আত্মিকভাবে হবে এ প্রশ্নে ওলামায়ে সালাফের মাঝে মতপার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। তবে সঠিক কথা হ'ল– কবরের আযাব আত্মা ও শরীর উভয়ের উপরই হবে। শরীর থেকে রূহ বেরিয়ে যাওয়ার পর তা আযাব কিংবা নে'মত ভোগ করতে থাকবে। আর নির্দিষ্ট সময়ে তা শরীরের সাথে যুক্ত হওয়ার মাধ্যমে শরীরও শাস্তির সম্মুখীন হবে; যার প্রমাণ হাদীছে পাওয়া যায় এবং যার নিদর্শন বাহ্যতঃই অনেক মৃত ব্যক্তির কবরে লক্ষ্য করা যায়। ইমাম ইবনে তায়মিয়াহ ও জমহূর ওলামায়ে সালাফ অনুরূপ মন্তব্য করেছেন *(ইবনু তায়মিয়াহ, আল-ইখতিয়ারাতুল ফিক্বহিয়াহ, পৃঃ ১/৪৪৯)*। আর প্রশ্নে উল্লেখিত সূরা বাক্বারাহ্র ২৮ নং আয়াতে মানুষের জীবন-মৃত্যুর পরিক্রমা উল্লেখ করা হয়েছে। সেখানে কবরের আযাব আসমানে হবে কি না এমন কোন সুস্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায় না। সর্বোপরি এ বিষয়ে অধিক আলোচনা অপ্রয়োজনীয়। কারণ এটি গায়েবী বিষয়। অতএব এ বিষয়ে কেবল হাদীছে যে বর্ণনা এসেছে তার উপর বিশ্বাস রাখাই যথেষ্ট।

প্রশ্ন (১২/২৫২) : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যুগে বাচ্চা মেয়েরা যে পুতুল নিয়ে খেলত, তা কি দিয়ে তৈরি ছিল? আমাদের দেশের মেয়েরা যে পুতুল নিয়ে খেলা করে তা কি বৈধ?

-আতাউর রহমান
নওদাপাড়া, রাজশাহী।

উত্তর : আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, আমি নবী করীম (ছাঃ)-এর সম্মুখে পুতুল নিয়ে খেলা করতাম আর আমার কিছু সাথীও আমার সাথে খেলা করত। যখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) প্রবেশ করতেন তখন তারা আত্মগোপন করত। কিন্তু তিনি তাদেরকে আমার নিকট পাঠিয়ে দিতেন, অতঃপর তারা আমার সাথে খেলত *(বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত হা/৩২৪৩)*। আয়েশা (রাঃ) মাটি দিয়ে নিজ হাতে এই পুতুলগুলো বানিয়েছিলেন। অতএব এভাবে মাটির পুতুল তৈরি করে তাকে কাপড় পরানো ও সেবাযত্ন করার মাধ্যমে ভবিষ্যতে সন্তান প্রতিপালনের প্রশিক্ষণ নিতে পারে। এতে দোষ নেই। কিন্তু এই অজুহাতে বাজার থেকে দেশী-বিদেশী বিভিন্ন প্রাণীর খেলনা পুতুল কিনে আনা জায়েয নয় *(মুহাম্মাদ বিন জামীল যায়নু, তাওজীহাত ইসলামিয়্যাহ, পৃঃ ১১২, বিস্তারিত দ্রঃ 'ছবি ও মূর্তি' বই)*।

উল্লেখ্য, বর্তমানে প্লাস্টিক দ্বারা বা এর চেয়ে উন্নত কোন পদার্থ দ্বারা কুকুর, বানর, বিড়াল, হাতি, ঘোড়া, মাছ, সাপ ইত্যাদির মূর্তি তৈরি করা হচ্ছে এবং তা আলমারি, ঘরে বা গাড়িতে রেখে দেওয়া হচ্ছে বা ঝুলিয়ে রাখা হচ্ছে এগুলো পুতুলের নামে মূর্তি পূজার শামিল। অতএব খেলনা পুতুল এমনকি প্রাণীর মূর্তি বিশিষ্ট মিষ্টান্ন বানানো ও তা ক্রয়-বিক্রয় থেকে বিরত থাকাই উত্তম।

প্রশ্ন (১৩/২৫৩) : জান্নাতের নীচে যে নহরসমূহ প্রবাহিত রয়েছে, সেসব কিসের?

-এরশাদ
সারুলিয়া, মোল্লাহাট, বাগেরহাট।

উত্তর : জান্নাতের নে'মতসমূহের মধ্যে নহর অন্যতম। এ নদীগুলো কিসের হবে তা পবিত্র কুরআনে এভাবে এসেছে, 'মুত্তাকীদেরকে যে জান্নাতের অঙ্গীকার দেয়া হয়েছে তার দৃষ্টান্ত হ'ল, সেখানে থাকবে নির্মল পানির নহরসমূহ, থাকবে দুধের নহরসমূহ যার স্বাদ হবে অপরিবর্তনীয় এবং পানকারীদের জন্য সুস্বাদু সুরার নহরসমূহ এবং পরিশোধিত মধুর নহরসমূহ' *(মুহাম্মাদ ১৫)*।

উক্ত নহরসমূহ প্রবাহিত হবে জান্নাতের তলদেশ দিয়ে *(রা'দ ৩৫)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'আমি জান্নাতে পরিভ্রমণরত ছিলাম এমতাবস্থায় এক নহরের নিকট পৌঁছলাম যার দু'পার্শ্বদেশ অগণিত তারকা সদৃশ বৃত্তাকার মুক্তায় মোড়ানো। আমি জিবরীলকে জিজ্ঞেস করলাম এটা কি? তিনি বললেন, এটাই হ'ল 'কাওছার' যা আল্লাহ আপনাকে দান করেছেন। এই বলে জিবরীল তাতে আঘাত করলে আমি দেখলাম তার মাটি হ'ল মিসকে আযফার অর্থাৎ খুবই উচ্চমানের সুগন্ধিময় *(বুখারী হা/৪৯৬৪; আহমাদ হা/১৩১৭৯)*।

প্রশ্ন (১৪/২৫৪) : আলু উৎপাদন করে বা ক্রয় করে হিমাগারে সাত আট মাস রাখা যাবে কি?

-মুহাম্মাদ এনামুল হক
লক্ষ্মীকোলা, শেরপুর, বগুড়া।

উত্তর : নিজের উৎপাদিত বা বাজার থেকে ক্রয়কৃত আলু ব্যবসা বা নিজের ব্যবহারের উদ্দেশ্যে হিমাগারে দীর্ঘদিন রাখলে তাতে কোন দোষ নেই *(ফতহুল বারী, পৃঃ ৯/৫০৪, তুহফাতুল আহওয়াযী, পৃঃ ৪/৪০৪)*। রাসূল (ছাঃ) নিজের পরিবারের জন্য এক বছরের খাদ্য মজুদ রেখেছেন *(বুখারী হা/৫৩৫৭)*। এতে অতিরিক্ত খাদ্যবস্তু মজুদ রাখা সম্ভব হয়, যা পরবর্তীতে প্রয়োজনমত ব্যবহার বা বাজারে যোগান দেওয়া সম্ভব হয়। তবে ব্যবসার জন্য মজুদ করার সময় অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে যেন বাজারে সে খাদ্যবস্তুর সংকট না থাকে। যদি ফটকাবাজারি বা বাজারে কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করে মুনাফাখোরীর উদ্দেশ্যে মজুদ করা হয় তবে অবশ্যই তা অপরাধ হবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি মজুদদারী করে সে পাপী *(মুসলিম, মিশকাত হা/২৮৯২)*। বর্তমানে ব্যবসায়ীরা পরিকল্পিতভাবে বাজারমূল্য বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে যে মজুদদারী করে, তা থেকে আল্লাহভীরু মুসলিম ব্যবসায়ীকে অবশ্যই বিরত থাকতে হবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, ব্যবসায়ীরা ক্বিয়ামতের দিন পাপী হিসাবে উত্থিত হবে; কেবল তারা ব্যতীত যারা আল্লাহকে ভয় করে, সৎকর্ম করে এবং ছাদাক্বা করে *(তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, সনদ হাসান, সিলসিলা ছহীহাহ হা/৯১৪)*।

প্রশ্ন (১৫/২৫৫) : যে বিবাহ অনুষ্ঠানে বাদ্যযন্ত্র বাজানো হয় এবং টাকা ও উপহার সামগ্রী গ্রহণ করা হয়, সে বিবাহ অনুষ্ঠানে দাওয়াত গ্রহণ করা যাবে কি?

-জাহাঙ্গীর আলম
সারুলিয়া, মোল্লাহাট, বাগেরহাট।

উত্তর : বাদ্যযন্ত্র ও অশ্লীল গান-বাজনা হারাম। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, সত্বর আমার উম্মতের মধ্যেকার কিছু লোক রেশমী কাতান, রেশমী কাপড়, মদ ও গান-বাদ্যকে হালাল মনে করবে *(বুখারী তা'লীক্ব, হা/৫৫৯০; মিশকাত হা/৫৩৪৩)*। আল্লাহ বলেন, 'লোকদের মধ্যে কিছু লোক অজ্ঞতা বশে বাজে কথা খরিদ করে মানুষকে আল্লাহ্র পথ থেকে বিচ্যুত করার জন্য এবং আল্লাহ্র পথকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে। তাদের জন্য রয়েছে মর্মন্তুদ শাস্তি' *(লোক্বমান ৬)*। ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বলেন, এখানে 'বাজে কথা' অর্থ গান-বাজনা *(ইবনু কাছীর)*। ছোট মেয়েরা বিবাহ অনুষ্ঠানে 'দফ' বাজাতে পারে এবং ইসলামী সঙ্গীত পরিবেশন করতে পারে *(মিশকাত হা/৩১৪০, ৩১৫৩)*। বিয়েতে উপহার দেওয়ার প্রচলিত প্রথার কোন দলীল পাওয়া যায় না। কেবল হাদিয়া প্রদানের সাধারণ নির্দেশের আলোকে এটি জায়েয হিসাবে

গণ্য হ'তে পারে। তবে যদি কেউ এটাকে অন্যভাবে গ্রহণ করেন, তাহ'লে তা মাকরূহ হবে। যয়নবের বিয়ের পর ওয়ালীমাতে উম্মে সুলায়েম (রাঃ) রান্না করা গোস্ত-রুটি হাদিয়া পাঠিয়ে রাসূলকে সাহায্য করেছিলেন এবং তিনি সবাইকে ডাকিয়ে তা খাইয়েছিলেন' *(বুখারী হা/৫১৬৩; মিশকাত হা/৩২১২)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, নিকৃষ্ট খানা হ'ল ওয়ালীমার ঐ খানা, যাতে কেবল ধনীদের দাওয়াত দেওয়া হয় এবং গরীবদের বাদ দেওয়া হয়' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৩২১৮)*।

বর্তমান যুগে বিয়ে এবং ওয়ালীমাতে উপহারের প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে। যাতে গরীব আত্মীয়গণ লজ্জায় পড়েন। সেকারণ তাক্বওয়ার দাবী হ'ল সকল প্রকার বাড়াবাড়ি ও প্রদর্শনী হ'তে দূরে থাকা এবং এই পবিত্র অনুষ্ঠানগুলিকে সহজ ও অনাড়ম্বর করা।

প্রশ্ন (১৬/২৫৬) : ছালাতের সামনে কোন স্বচ্ছ কাঁচ বা টাইল্‌স লাগানো থাকলে তাতে যদি ছায়া দেখা যায় তাহ'লে ছালাত আদায় হবে কি?

-সুমাইয়া
গণবিশ্ববিদ্যালয়, সাভার, ঢাকা।

উত্তর : এক্ষেত্রে দু'টি বিষয় রয়েছে। (১) সাধারণভাবে কোন স্থানে ছবি-মূর্তি থাকলে সেখানে ছালাত আদায় করা যাবে না। কেননা ছবি-মূর্তি সংরক্ষণ করা হারাম *(মুসলিম, মিশকাত হা/১৬৯৬)* এবং যে ঘরে ছবি-মূর্তি বা কুকুর থাকে সে ঘরে রহমতের ফেরেশতা প্রবেশ করেন না *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৪৪৮৯)*। তবে সামনে রক্ষিত কাঁচ বা টাইল্‌সে স্বীয় প্রতিচ্ছায়া দেখা গেলে তাতে কোন সমস্যা নেই। কেননা এটা ছবি-মূর্তির হুকুমে পড়ে না। (২) যদি এই প্রতিচ্ছায়ার কারণে ছালাতে মনোযোগ বিঘ্ন হয়, তবে তা পর্দা বা অন্য কিছুর মাধ্যমে আড়াল করে দিতে হবে। যেন ছালাতে খুশূ-খুযূ বিনষ্ট না হয়।

প্রশ্ন (১৭/২৫৭) : আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রাঃ) একদা বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যেভাবে ছালাত আদায় করতেন আমি কি তোমাদের সেভাবে ছালাত আদায় করে দেখাব না? অতঃপর তিনি ছালাত আদায় করলেন। কিন্তু তাকবীরে তাহরীমা ব্যতীত অন্য কোন সময় দু'হাত উত্তোলন করলেন না' (তিরমিযী ১/৩৫)। তিরমিযী হাদীছটিকে হাসান বলেছেন। আবার বারা ইবনে আযিব (রাঃ) বলেন, 'নবী করীম (ছাঃ) তাকবীরে তাহরীমা ব্যতীত আর কখনো হাত উঠাতেন না' (আবূদাঊদ ১/১০৯)। এক্ষণে ছালাতে রাফ'উল ইয়াদায়েন করার প্রমাণে হাদীছদ্বয়ের বিপক্ষে যুক্তি কি?

-ছিয়াম বিন সাইফুদ্দীন
মধুপুর, টাংগাঈল।

উত্তর : প্রশ্নে বর্ণিত হাদীছ দু'টি সহ 'রাফ'উল ইয়াদায়েন' না করার পক্ষে যে সকল দলীল পেশ করা হয়, তার সবগুলিই যঈফ। প্রশ্নে বর্ণিত ১ম হাদীছটি ইমাম আবুদাঊদ বর্ণনা করে বলেন, هَذَا مُخْتَصَرٌ مِنْ حَدِيثٍ طَوِيلٍ وَلَيْسَ هُوَ بِصَحِيحٍ عَلَى هَذَا اللَّفْظِ 'এটা লম্বা হাদীছের সংক্ষিপ্ত রূপ। আর এই শব্দে এটি ছহীহ নয়' *(আবুদাঊদ হা/৭৪৮)*। উল্লেখ্য যে, উপমহাদেশের ছাপা আবুদাঊদে হাদীছের শেষে ইমাম আবুদাঊদের উক্ত মন্তব্যটি নেই। কিন্তু অন্যান্য ছাপা আবুদাঊদে তা রয়েছে। এদেশে ছাপা আবুদাঊদ থেকে উক্ত মন্তব্য তুলে দেওয়ার রহস্য অজ্ঞাত।

দ্বিতীয় হাদীছটি সম্পর্কে তিনি বলেন, هَذَا الْحَدِيثُ لَيْسَ بِصَحِيحٍ 'এই হাদীছ ছহীহ নয়' *(আবুদাঊদ হা/৭৫২)*। তাছাড়া বারা ইবনু আযিব (রাঃ) হতে বর্ণিত অন্য আরেকটি বর্ণনা সম্পর্কে তিনি বলেন, 'অতঃপর তিনি আর হাত উঠাননি' অংশটুকু অন্য সনদে তিনি বলেননি। সুফিয়ান বলেন, আমাদেরকে অনেক পরে কূফাতে 'অতঃপর তিনি আর হাত উঠাননি' অংশটুকু বলা হয়েছে। ইমাম আবুদাঊদ আরো বলেন, ইয়াযীদ থেকে হাদীছটি হুশাইম, খালেদ, ইবনু ইদরীসও বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তারা 'অতঃপর তিনি আর হাত উঠাননি' অংশটুকু বলেননি' *(আবুদাঊদ হা/৭৫০)*। এভাবে ইমাম আবুদাঊদ (২০২-২৭৫) রাফ'উল ইয়াদায়েন না করার হাদীছ সমূহকে নাকচ করে দিয়েছেন।

ইবনু হিব্বান বলেন, 'রাফ'উল ইয়াদায়েন' না করার পক্ষে কুফাবাসীদের এটিই সবচেয়ে বড় দলীল হ'লেও এটিই সবচেয়ে দুর্বলতম দলীল, যার উপরে নির্ভর করা হয়েছে। কেননা এর মধ্যে এমন সব বিষয় রয়েছে যা একে বাতিল বলে গণ্য করে *(নায়লুল আওত্বার ৩/১৪ পৃঃ, ফিকহুস সুন্নাহ ১/১০৮)*।

ইমাম তিরমিযী (মৃঃ ২৭৯হিঃ) ১ম হাদীছটিকে সনদের দিক থেকে 'হাসান' বললেও তার আগের হাদীছে আলোচনা করতে গিয়ে তিনি আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারকের বক্তব্য তুলে ধরেছেন, لم يثبت حديث ابن مسعود 'ইবনু মাসঊদ (রাঃ)-এর হাদীছ প্রমাণিত হয়নি' *(তিরমিযী হা/২৫৫-এর আলোচনা)*। আলবানী (রহঃ) বলেন, হাদীছটিকে ছহীহ মেনে নিলেও তা 'রাফ'উল ইয়াদায়েন'-এর পক্ষে বর্ণিত ছহীহ হাদীছ সমূহের বিপরীতে পেশ করা যাবে না। কেননা এটি না বোধক এবং ঐগুলি হ্যাঁ বোধক। ইলমে হাদীছের মূলনীতি অনুযায়ী হ্যাঁ-বোধক হাদীছ না-বোধক হাদীছের উপর অগ্রাধিকার পাবে।

পক্ষান্তরে রাফ'উল ইয়াদায়নের পক্ষে বহু ছহীহ হাদীছ রয়েছে। যেমন ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছালাতের শুরুতে, রুকূতে যাওয়াকালীন ও রুকূ হ'তে উঠাকালীন সময়ে... এবং তৃতীয় রাক'আতে দাঁড়ানোর সময় রাফ'উল ইয়াদায়েন করতেন' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, বুখারী, মিশকাত হা/৭৯৩-৯৪)*।

'রাফ'উল ইয়াদায়েন' করা সম্পর্কে চার খলীফা সহ প্রায় ২৫ জন ছাহাবী থেকে বর্ণিত ছহীহ হাদীছ সমূহ রয়েছে।

একটি হিসাব মতে ‘রাফ‘উল ইয়াদায়েন’-এর হাদীছের রাবী সংখ্যা আশারায়ে মুবাশশারাহ সহ অন্যূন ৫০ জন ছাহাবী *(ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/১০৭ পৃঃ)* এবং সর্বমোট ছহীহ হাদীছ ও আছারের সংখ্যা অন্যূন চারশত *(মাজদুদ্দীন ফীরোযাবাদী, সিফরুস সা‘আদাত ১৫ পৃঃ; বিস্তারিত দ্রঃ ছালাতুর রাসূল (ছাঃ), পৃঃ ৯২-৯৬)*।

প্রশ্ন (১৮/২৫৮) : ছালাতে দাঁড়ানোর আদব কি? ছালাত অবস্থায় ডান পা অথবা ডান পায়ের বুড়ো আঙ্গুল নাকি কোন অবস্থাতেই নড়াচড়া করা যাবে না। ছহীহ হাদীছের আলোকে বিষয়টি জানতে চাই।

-নাঈম
চাঁনগাও, নরসিংদী।

উত্তর : ছালাতের জন্য ওযূ করে পবিত্র হয়ে পরিচ্ছন্ন পোষাক ও দেহ-মন নিয়ে কা‘বা গৃহপানে মুখ ফিরিয়ে মনে মনে ছালাতের সংকল্প করে বিনম্রচিত্তে দাঁড়াতে হবে। আল্লাহ বলেন, قُوْمُوْا لِلّٰـــهِ قَـــانِتِيْنَ ‘তোমরা আল্লাহ্র জন্য নিবিষ্টচিত্তে দাঁড়িয়ে যাও’ *(বাক্বারাহ ২/২৩৮)*। পায়ে পা, টাখনুর সাথে টাখনু ও কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাতারের মাঝে দাঁড়াবে *(বুখারী, মিশকাত হা/১০৮৬, ১১০২, ১০৯৩)*। ডান পায়ের বুড়ো আঙ্গুল নড়াচড়া করা যাবে না মর্মে কোন দলীল পাওয়া যায় না। তবে দাঁড়ানোর সময় পায়ের আঙ্গুলগুলো কিবলামুখী করে দাঁড়াবে *(বুখারী, বুলূগুল মারাম হা/২৬৬)*।

প্রশ্ন (১৯/২৫৯) : যমযম কূপের পানি পানের যে দো‘আ প্রচলিত আছে, তা কি ছহীহ? اللهم إني أسألك علما نافعـــا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء

- নূরজাহান
কালিয়াকৈর, গাযীপুর।

উত্তর : যমযম কূপের পানি পানের সময় উক্ত দো‘আ পাঠের হাদীছটি যঈফ *(ইরওয়াউল গালীল, ৪/৩৩পৃঃ, হা/১১২৬-এর আলোচনা দ্রঃ; যঈফ আত-তারগীব হা/৭৫০)*। তাই সাধারণ দো‘আ হিসাবে ‘বিসমিল্লাহ’ বলবে।

প্রশ্নঃ (২০/২৬০) : আমার একমাত্র মেয়েকে মৃত্যুর আগে বাড়ি ও সম্পত্তি লিখে দিতে পারি কি?

-হাসিবুল হক
আটুয়া খাঁ পাড়া, পাবনা।

উত্তর : মৃত্যুর পূর্বে কোন সম্পত্তি লিখে দেওয়া শরী‘আত সম্মত নয়। কারণ তার মৃত্যুর পূর্বে মেয়ের মৃত্যু হ’তে পারে। তখন শরী‘আতের দৃষ্টিতে সে বা তার ছেলে মেয়ে উক্ত সম্পত্তির অধিকারী হবে না। এক্ষেত্রে সে শরী‘আতের হুকুম লংঘন করল।

প্রশ্ন (২১/২৬১) : গীবতের কাফফারা কি এবং এর পাপ থেকে মুক্তির উপায় কি?

-মুহাম্মাদ সোহাইল
পিটিআই মাষ্টারপাড়া, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তর : গীবতের কাফফারা হচ্ছে যার গীবত করা হয়েছে তার নিকটে ক্ষমা চাওয়া। যেমন আবুবকর ও ওমর (রাঃ) তাঁদের খাদেমের গীবত করলে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ঐ খাদেমের নিকট ক্ষমা চাইতে বলেন *(আমাসিক আলায়কা লিসানাকা, পৃঃ ৪৩)*। তবে সরাসরি ক্ষমা চাইতে গেলে যদি ফিৎনার সৃষ্টি হয়, তাহ’লে তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে। আর তার কুৎসা রটনার পরিবর্তে তার প্রশংসা করতে হবে *(ঐ, পৃঃ ৫৭)*।

প্রশ্ন (২২/২৬২) : প্রচলিত চিল্লা প্রথা কি হাদীছ সম্মত?

-মুহাম্মাদ সাইফুল ইসলাম
কাজলা, রাজশাহী।

উত্তর : চিল্লা প্রথার প্রমাণে কোন হাদীছ নেই। এগুলি কপোলকল্পিত পদ্ধতি। এর ভিত্তি হচ্ছে মাওলানা ইলিয়াসের স্বপ্নের উপর। যেমন তিনি বলেন, এই তাবলীগের নিয়ম আমার নিকটে স্বপ্নে প্রকাশিত হয় *(আব্দুর রহমান উমরী, তাবলীগী জামা‘আত (নয়াদিল্লী : দারুল কিতাব, ১৯৮৮, পৃঃ ১৩)*। ১ চিল্লা, ৩ চিল্লা, বছর চিল্লার জন্য কোটি কোটি গুণ ছওয়াব ও মিথ্যা ফাযায়েলের কথা বলে মানুষকে ঘর থেকে বের করে নেওয়া হয়। তাকে পারিবারিক ও সামাজিক দায়িত্ব থেকে দূরে সরিয়ে রাখা হয়, যা একেবারেই অন্যায়। সুতরাং সংসারধর্ম ত্যাগ করে এসব চিল্লা দেওয়া থেকে বিরত থাকতে হবে।

প্রশ্ন (২৩/২৬৩) : পবিত্র কুরআন মুখস্থ রাখার বিনিময়ে একজন হাফেয পরকালে কি পুরস্কার লাভ করবেন?

-আমিনা খাতুন
মুজিবনগর, মেহেরপুর।

উত্তর : পবিত্র কুরআন মুখস্থকারী হাফেযগণ পরকালে উচ্চ মর্যাদার অধিকারী হবেন। আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, ‘ক্বিয়ামতের দিন কুরআনের হাফেযকে বলা হবে কুরআন তেলাওয়াত করতে থাক এবং জান্নাতের উপরের দিকে আরোহন করতে থাক। অক্ষর ও শব্দ স্পষ্ট করে তেলাওয়াত করতে থাক, যেভাবে দুনিয়াতে তেলাওয়াত করতে। তোমার তেলাওয়াতের সর্বশেষ স্তর হবে তোমার বসবাসের সর্বোচ্চ স্থান’ *(আহমাদ, তিরমিযী, আবু দাঊদ, নাসাঈ, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/২১৩৪)*।

অনেকে বলেন, এই মর্যাদা সকল কুরআন পাঠকারীর জন্য। আসলে তা সঠিক নয়। শায়খ আলবানী বলেন, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হ’ল কুরআনের হাফেয। এই মর্যাদার স্তর হ’ল- জান্নাতের স্তর। কুরআন তেলাওয়াতকারী সাধারণের জন্য এই মর্যাদা নয় যেমন কেউ কেউ ধারণা করেন। বরং এর মধ্যে কুরআনের হাফেযের জন্য স্পষ্ট মর্যাদা রয়েছে, যে শুধু আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্যই হেফয করে *(সিলসিলা ছহীহাহ হা/২২৪০-এর আলোচনা দ্রঃ)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, নিশ্চয়ই মানুষের

মধ্যে দুই শ্রেণীর মানুষ আল্লাহ্র পরিবার হবেন। একজন হ'লেন কুরআনের অধিকারী ও অন্যজন হ'লেন তার খাছ বন্ধুবর্গ' *(ইবনু মাজাহ হা/২১৫, সনদ ছহীহ)*।

প্রশ্ন (২৪/২৬৪) : শয়নকালে আয়াতুল কুরসী পাঠ করলে চুরি-ডাকাতি হ'তে নিরাপদ থাকা যায়। একথা কি ঠিক?

-মুসাম্মাৎ গুলনেহার
গাছবাড়ী, সিলেট।

উত্তর : শয্যা গ্রহণকালে 'আয়াতুল কুরসী' পাঠ করলে শয়তানের কবল থেকে নিরাপদ থাকা যায়। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'বিছানায় শয়নকালে 'আয়াতুল কুরসী' পাঠ করলে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে একজন রক্ষক নিযুক্ত হয়। ফলে সকাল পর্যন্ত শয়তান ঐ ব্যক্তির নিকটবর্তী হ'তে পারে না' *(বুখারী, মিশকাত হা/২১২৩ 'ফাযায়েলুল কুরআন' অধ্যায়)*।

প্রশ্ন (২৫/২৬৫) : যথাযথ পর্দা বলতে কি বুঝায়? স্ত্রীকে কিভাবে পর্দায় রাখলে স্বামী জান্নাতের আশা করতে পারে?

-উজ্জ্বল
বজরপুর, মৌগাছি, রাজশাহী।

উত্তর : পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছে যেভাবে পর্দা করার কথা বলা হয়েছে, সেভাবে পর্দা করাই হচ্ছে যথার্থ পর্দা। আল্লাহ বলেন, 'ঈমানদার নারীদের বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে নত রাখে এবং তাদের যৌনাঙ্গের হেফাযত করে। তারা যেন যা সাধারণতঃ প্রকাশমান তা ব্যতীত তাদের সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে এবং তারা যেন তাদের মাথার ওড়না বক্ষদেশে ফেলে রাখে এবং তারা যেন তাদের স্বামী, পিতা, শ্বশুর, পুত্র, স্বামীর পুত্র, ভ্রাতা, ভ্রাতুষ্পুত্র, ভগ্নিপুত্র, স্ত্রীলোক, অধিকারভুক্ত বাঁদি, যৌনকামনামুক্ত পুরুষ ও বালক, যারা নারীদের গোপন অঙ্গ সম্পর্কে অজ্ঞ, তাদের ব্যতীত কারো কাছে তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে। তারা যেন এমনভাবে পদচারণা না করে যাতে তাদের গোপন সাজ-সজ্জা প্রকাশ পায়' *(নূর ৩১)*।

অনুরূপভাবে তাদেরকে নিজেদের ঘরে অবস্থান করতে হবে। অন্য লোকদের সাথে কথা বলার সময় নরম সুরে কথা বলা যাবে না *(আহযাব ৩২-৩৩)*। প্রয়োজনে বাড়ীর বাইরে যেতে হ'লে গায়ে বড় চাদর ঝুলিয়ে (বোরকা পরে) পুরা শরীর ঢেকে যেতে হবে' *(আহযাব ৫৯)*। কারো কাছে কিছু চাইতে হ'লে পর্দার আড়াল থেকে চাইবে' *(আহযাব ৫৩)*। উপরোক্ত নিয়মে স্বামী স্বীয় স্ত্রীকে পর্দায় রাখলে তিনি জান্নাত লাভের আশা করতে পারেন।

প্রশ্ন (২৬/২৬৬) : যে মাঠে গরু, ছাগল চরে সে মাঠে ঈদের ছালাত আদায় করা সিদ্ধ হবে কি?

-আবুবকর ছিদ্দীক
বর্ষাপাড়া, কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ।

উত্তর : গোচারণ ভূমিতে ছালাত আদায় করা যাবে *(তিরমিযী, মিশকাত হা/৭৩৯, ইরওয়াউল গালীল হা/৭৭)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, যমীন সর্বত্রই মসজিদ, কবরস্থান ও গোসলখানা ব্যতীত' *(আবুদাঊদ, তিরমিযী ও দারেমী, মিশকাত হা/৭৩৭)*।

প্রশ্ন (২৭/২৬৭) : ক্বিয়ামতের দিন সকল মানুষ কি বস্ত্রহীন অবস্থায় উঠবে? সেদিন কারো পরণে কাপড় থাকবে কি?

-মুহাম্মাদ মুজাহিদ
বালিয়াডাঙ্গী, ঠাকুরগাঁও।

উত্তর : ক্বিয়ামতের দিন সকল মানুষ বস্ত্রহীন নগ্নদেহে উঠবে *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫৫৩৬)*। এদিন ইবরাহীম (আঃ)-কে সর্বপ্রথম কাপড় পরানো হবে *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫৫৩৫)*।

প্রশ্ন (২৮/২৬৮) : বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমে 'জাহদুল বালা' শব্দের দ্বারা জন্ম নিয়ন্ত্রণকে বৈধ করার প্রমাণ পেশ করা হয়। এ শব্দটি কি কোন হাদীছের অংশ? এর তাৎপর্য কি?

-আযীযুল হক
সিতাইকুণ্ডু, কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ।

উত্তর : 'জাহদুল বালা' বাক্যটি হাদীছের অংশ *(বুখারী হা/৬৩৪৭; মুসলিম হা/২৭০৭)*। রাসূল (ছাঃ) 'জাহদুল বালা' হ'তে আল্লাহ্র নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করতে বলেছেন। এর দ্বারা যারা জন্ম নিয়ন্ত্রণের দলীল পেশ করেন তারা বলেন যে, এর অর্থ হ'ল, 'কম সম্পদের সাথে পরিবারের সদস্য সংখ্যা বেশী হওয়া'। আর এ থেকেই পানাহ চাইতে বলা হয়েছে। উক্ত অর্থের পিছনে একটি যঈফ হাদীছ বর্ণিত হয়েছে- جهد البلاء كثرة العيال مع قلة الشيء *(বিস্তারিত দ্রঃ সিলসিলা যঈফাহ হা/২৫৯২; যঈফুল জামে' হা/২৬৪১)*। যেহেতু হাদীছটি যঈফ, তাই উক্ত ব্যাখ্যা গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা 'জাহদুল বালা' বাক্যের সঠিক অর্থ হচ্ছে, কঠিন অবস্থা, কঠিন বিপদ ইত্যাদি *(আন-নিহায়াহ্ ফী গারীবিল হাদীছ ১/৮৪৮; গারীবুল হাদীছ লি ইবনুল জাওযী ১/১৮২)*। সুতরাং জন্ম নিয়ন্ত্রণের সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই।

প্রশ্ন (২৯/২৬৯) : কোন পুরুষ ইমাম মহিলাদেরকে দ্বীনের তা'লীম দিতে বা মহিলারা ইমামের নিকট থেকে প্রশ্ন করে কোন কিছু জেনে নিতে পারে কি?

-শাহানারা
রাজপাট, মোল্লাহাট, বাগেরহাট।

উত্তর : পর্দার আড়াল থেকে মহিলারা ইমামের নিকট থেকে কুরআন এবং হাদীছের তা'লীম নিতে পারবে এবং প্রশ্ন করে উত্তরও জেনে নিতে পারবে *(বুখারী, মিশকাত হা/১৭৫৩)*।

প্রশ্ন (৩০/২৭০) : বিভিন্ন ধরনের প্রাণী ও কীট-পতঙ্গ যেমন সাপ, বিচ্ছু, মশা, মাছি, ইঁদুর, কুকুর, বিড়াল ইত্যাদি আমাদের দৈনন্দিন জীবনে ক্ষতি করার কারণে তাদেরকে হত্যা করলে আমাদের কোন গোনাহ হবে কী?

-তানভীর
বুড়িচং, কুমিল্লা।

উত্তর : অকারণে কোন প্রাণী হত্যা বা গাছপালা বিনষ্ট করা ইসলামে নিষিদ্ধ। তবে মানুষের অপকার বা ক্ষতি সাধন করে এমন প্রাণী, গাছপালা নিধনে কোন বাধা নেই। যেমন রাসূল (ছাঃ) সাপ নিধনকে উম্মতের জন্য সিদ্ধ করেছেন। কেননা তা মানুষের জন্য ক্ষতিকর। রাসূল (ছাঃ) বলেন, মুহরিম বা হালাল সর্বাবস্থায় পাঁচটি প্রাণী হত্যায় কোন দোষ নেই, সেগুলো হ'ল– সাপ, কাক, ইঁদুর, পাগলা কুকুর ও চিল *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/২৬৯৯)*। কোন কোন রেওয়ায়েতে সাপের পরিবর্তে বিচ্ছুর কথা উল্লেখ রয়েছে।

প্রশ্ন (৩১/২৭১): শৈশবে কোন পাপ কাজ করে থাকলে এবং অন্যের হক নষ্ট করে থাকলে বড় হওয়ার পর তার কিছু করণীয় আছে কি?

-মুহাম্মাদ কামরুল ইসলাম
বুড়িচং, কুমিল্লা।

উত্তর : অবুঝ বয়সে কোন অন্যায় করে থাকলে তা গোনাহের খাতায় লিপিবদ্ধ হবে না। কারণ তিন শ্রেণীর লোক থেকে কলম উঠিয়ে নেয়া হয়েছে ... যার মধ্যে একজন হ'ল অপ্রাপ্ত বয়স্ক শিশু *(ছহীহ আবুদাঊদ হা/৪৪০১, ৪৪০২; ছহীহ তিরমিযী হা/১৪২৩)*। তবে যুবকের আলামত পাওয়া না গেলেও বুদ্ধিমান হ'লে তার গোনাহ লিপিবদ্ধ করা হবে (*ছহীহ আবুদাঊদ হা/৪৩৯৯*)। অতএব পূর্ণাঙ্গ বুদ্ধিমান হওয়ার পরে কোন অন্যায় করে থাকলে তার জন্য তওবা করবে আর কারো হক নষ্ট করে থাকলে তা ফিরিয়ে দিবে *(বুখারী, মিশকাত হা/৫১২৬)*।

প্রশ্ন (৩২/২৭২) : আমি একটি মসজিদের বেতনভুক ইমাম। আমাকে ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় সমাজের এমন অনেক মানুষের বাড়িতে খেতে হয়, যাদের উপার্জন হালাল নয়। এমনকি অনেকে ছালাতও আদায় করে না। এমতাবস্থায় আমার করণীয় কী?

-মাসঊদ আরাফাত
কাওনডাঙ্গা, সাতক্ষীরা।

উত্তর : যদি জানা যায় যে, তার উপার্জন স্পষ্ট হারাম তাহ'লে তার বাড়ীতে খাওয়া যাবে না *(মুসলিম, মিশকাত হা/২৭৬০)*। তবে উপার্জিত সম্পদ হারাম হ'লেও খাদ্যটি হারাম না হ'লে তার বাড়িতে খাওয়া যাবে। কারণ রাসূল (ছাঃ) ইহুদীর খাদ্য খেয়েছেন যাদের উপার্জন হারাম পন্থাতেও হয়ে থাকে *(আহমাদ হা/১২৭৮৯, ১৩৪৪৮; বুখারী হা/২৬১৭; মুসলিম হা/২১৯০)*।

প্রশ্ন (৩৩/২৭৩) : দাজ্জাল কার বংশধর? সে কি আদম (আঃ)-এর ঔরসজাত সন্তান? বিস্তারিত জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আমীনুল ইসলাম
শেরপুর ফায়ার সার্ভিস, বগুড়া।

উত্তর : ছহীহ হাদীছের বর্ণনা অনুযায়ী জানা যায় দাজ্জাল শেষ যামানার কোন আদম সন্তানের ঔরসজাত হবে। সে খোরাসান থেকে বের হবে *(ছহীহ তিরমিযী হা/২২৩৭; ছহীহ ইবনু মাজাহ হা/৪০৭২)*। সে একজন কাফের, তার কোন সন্তান থাকবে না এবং সে মক্কা এবং মদীনায় প্রবেশ করতে সক্ষম হবে না *(ছহীহ তিরমিযী হা/২২৪৬; ছহীহ জামে'উছ ছাগীর হা/৩৪০৩)*। তার ডান চোখ অন্ধ হবে (*ছহীহ তিরমিযী হা/২২৪১*)।

প্রশ্ন (৩৪/২৭৪) : সীমান্ত পথে অবৈধভাবে ব্যবসা করা কি শরী'আত সম্মত? ন্যায্য মূল্য দিয়েই অন্য দেশ থেকে জিনিসটি ক্রয় করে আনা হয়। কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জানিয়ে বাধিত করবেন।

-রেযওয়ান
মিয়াপাড়া, গোপালগঞ্জ।

উত্তর : জাতীয় রাজস্ব আয়ের মাধ্যম হিসাবে সরকারীভাবে সীমান্তে যে ট্যাক্স ধার্য করা হয়, তা ফাঁকি দেওয়ার উদ্দেশ্যে অবৈধ পথে মালামাল পাচার করে ব্যবসা করা হারাম। কেননা রাষ্ট্রীয় স্বার্থ মানেই জনস্বার্থ। আর জনস্বার্থের ক্ষতি করা ইসলাম অনুমোদন করে না। ইসলামী রাষ্ট্রে এ ধরনের অপরাধকে চুরির অপরাধ হিসাবে গণ্য করা হবে *(মুসলিম হা/৩২৫)*। আর সাধারণভাবে একজন ঈমানদার ব্যক্তি কখনো অন্যের ক্ষতিসাধন করে আপন স্বার্থ হাছিল করতে পারে না।

প্রশ্ন (৩৫/২৭৫) : আমার পিতা দীর্ঘ সাড়ে তিন বছর রোগ ভোগের পর মৃত্যুবরণ করেন। এ সময় তিনি সংজ্ঞাহীন থাকায় ছালাত আদায় করতে পারেননি। তার মৃত্যুর পর এই ক্বাযা ছালাতের কাফফারা আদায় প্রসঙ্গে এলাকার জনৈক মাওলানা বলেছেন যে, তার প্রতি ওয়াক্ত ক্বাযা ছালাতের জন্য ৬৫ টাকা হারে প্রায় ৩৫০০০ টাকা ছাদাক্বা করতে হবে। তার এ বক্তব্য কি সঠিক? এ বিষয়ে দলীল ভিত্তিক ফায়ছালা জানিয়ে বাধিত করবেন।

ইউসুফ, সিঙ্গাপুর।

উত্তর : প্রথমতঃ কোন ব্যক্তি কারো পক্ষ থেকে ছালাত করতে পারে না। কেননা মানুষ তা-ই পাবে, যা সে নিজে করে *(নজম ৩৯)*। কোন ব্যক্তি অসুস্থ থাকলে জ্ঞান থাকা পর্যন্ত তাকে ছালাত নিজেকেই আদায় করতে হবে যদি ইশারার মাধ্যমেও হয়। সময় মত আদায় করতে না পারলে সুস্থ হ'লে পরে ক্বাযা করবে। তবে প্রশ্নে উল্লেখিত ব্যক্তি এই হুকুমের অন্তর্ভুক্ত নন। কেননা সংজ্ঞাহীন থাকায় তিনি মা'যূর। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, তিন ব্যক্তি থেকে কলম উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে। (১) ঘুমন্ত ব্যক্তি যতক্ষণ না জাগ্রত হয় (২) শিশু যতক্ষণ না বালেগ হয় (৩) পাগল

যতক্ষণ না বুদ্ধি ফিরে পায় *(তিরমিযী, আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৩২৮৭ 'বিবাহ' অধ্যায়, 'খোলা ও তালাক' অনুচ্ছেদ-১১)*।

প্রশ্ন (৩৬/২৭৬) : আরবী পড়তে না পারার কারণে বাংলায় উচ্চারণ করে কুরআন তেলাওয়াত করলে ছওয়াব পাওয়া যাবে কি? কুরআন মুখস্থ তেলাওয়াত করলে ছওয়াবের কোন কম-বেশী হবে কি?

-রূহুল আমীন
পলাশ, নরসিংদী।

উত্তর : আরবী পড়ে কুরআন শিক্ষা করে কুরআন তেলাওয়াত করতে হবে *(বুখারী, মিশকাত হা/২১০৯)*। কুরআন শিক্ষা করার জন্য অক্ষরগুলি উচ্চারণ ও শব্দ বুঝার জন্য বাংলা উচ্চারণের সাহায্য নেওয়া যেতে পারে। কুরআন পড়ার জন্য চেষ্টা করলে দ্বিগুণ নেকী রয়েছে *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/২১১২)*। কুরআন শিক্ষা করার চেষ্টা না করে শুধু বাংলা বা অন্য কোন ভাষায় উচ্চারণ করে পড়া উচিত নয়। কারণ এভাবে পড়লে কুরআন শিক্ষা করার গুরুত্ব ও ফযীলত থাকবে না। এছাড়াও উচ্চারণ সঠিক না হওয়ার কারণে অর্থের মধ্যে গোলমাল হয়ে যাবে।

পবিত্র কুরআন মুখস্থ তেলাওয়াত করলে ছওয়াবে কোন কম-বেশী হবে না *(ছহীহ তিরমিযী হা/২৯১০)*। কারণ এতে দেখে আর মুখস্থ পড়ার মধ্যে কোন পার্থক্য করা হয়নি।

প্রশ্ন (৩৭/২৭৭) : টিভি ও রেডিওতে কুরআন তেলাওয়াত, কুরআনের তাফসীর ও ইসলামী অনুষ্ঠান শুনলে ছওয়াব পাওয়া যাবে কি?

-ডাঃ শফীকুল ইসলাম খাঁন
সদর হাসপাতাল, পাবনা।

উত্তর : টিভি ও রেডিওতে কুরআন তেলাওয়াত, কুরআনের বিশুদ্ধ তাফসীর ও ইসলামী অনুষ্ঠান শুনলে ছওয়াব পাওয়া যাবে। কারণ যন্ত্রটি হারাম নয়। অতএব এগুলি থেকে ভালো কিছু শুনলে বা শিখলে অবশ্যই ছওয়াব পাওয়া যাবে। কিন্তু অনৈসলামিক কিছু দেখলে বা শুনলে গোনাহ হবে।

প্রশ্ন (৩৮/২৭৮) : জায়নামাযের পাটিতে নকশা থাকলে ছালাত পড়া যাবে কি?

-মুহাম্মাদ জারজিস
মোল্লাহাট, বাগেরহাট।

উত্তর : নকশাযুক্ত জায়নামাযে ছালাত আদায় করা ঠিক নয়। কারণ এতে ছালাতের একাগ্রতা নষ্ট হওয়ার আশংকা থাকে। একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নকশাযুক্ত চাদরে ছালাত আদায় করছিলেন এবং নকশার কারণে তাঁর ছালাতের একাগ্রতা বিনষ্ট হয়। ফলে ছালাত শেষে তিনি বলেন, চাদরটি আবু জাহমের নিকট দিয়ে আস *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৭৫৭)*।

প্রশ্ন (৩৯/২৭৯) : আমানতের খেয়ানত বলতে কী বুঝায়? কারো নিকট কোন কথা বললে ও তা অন্যের নিকট প্রকাশ করে দিলে তা কি আমানতের খেয়ানত হবে?

-ফযলুল হক
বংশাল, ঢাকা।

উত্তর : আমানতের খেয়ানত করা মুনাফিকের আলামত সমূহের অন্যতম। কারো নিকট কোন কথা আমানত স্বরূপ বললে তা অন্যের নিকট প্রকাশ করে দিলে তা আমানতের খেয়ানত হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, মুনাফিকের আলামত তিনটি। (১) যখন সে কথা বলে, তখন সে মিথ্যা বলে (২) আর যখন সে অঙ্গীকার করে, তখন তা ভঙ্গ করে (৩) এবং যখন তার নিকট কিছু গচ্ছিত রাখা হয়, তখন সে খেয়ানত (আত্মসাৎ) করে *(মুসলিম, মিশকাত হা/৪৮)*।

প্রশ্ন (৪০/২৮০) : বিড়ি, সিগারেট, গুল, তামাক ও জর্দা এগুলির ব্যবসা করা যাবে কি?

-মানছূরা
কৈর্বত্তগ্রাম, সাপাহার, নওগাঁ।

উত্তর : উক্ত বস্তুগুলি নেশা জাতীয় দ্রব্য। নেশাদার দ্রব্য মাত্রই হারাম। হারাম বস্তু খাওয়া যেমন হারাম, তার ব্যবসাও তেমন হারাম। রাসূল (ছাঃ) বলেন, আল্লাহ তা'আলা যখন কোন সম্প্রদায়ের উপর কোন কিছু খাওয়া হারাম করেন, তখন তিনি তার ব্যবসাও হারাম করেন *(আবুদাঊদ হা/৩৪৮৮)*। মহান আল্লাহ বলেন, 'তিনি তাদের জন্য যাবতীয় পবিত্র বস্তু হালাল ঘোষণা করেন ও নিষিদ্ধ করেন হারাম বস্তু সমূহ' *(আ'রাফ ১৫৭)*। আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একদা মসজিদে গিয়ে বললেন, মদের ব্যবসা করা হারাম *(মুসলিম হা/৪০২৩ 'ক্রয়-বিক্রয়' অধ্যায়)*। যে সমস্ত বস্তু পান করা হারাম, সেগুলোর ব্যবসা করাও হারাম *(মুসলিম হা/৪০২০)*।